বড়দের বয়ান

ধোঁকাবাজ ব্যক্তি নবীজীর উম্মত নয়

মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

২৩শে সেপ্টেম্বর ২০১৬ খ্রিস্টাব্দে মসজিদুল আবরার, বছিলা রোড, মুহাম্মাদপুরে অনুষ্ঠিত মজলিসে আইম্মায়ে মাসাজিদের বয়ান

হামদ ও সালাতের পর...

এক বুযুর্গ বলেছিলেন, আল্লাহ তা'আলা কখন আমাকে স্মরণ করেন আমি তা বুঝতে পারি। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, কীভাবে বুঝতে পারেন? তিনি জবাব দিলেন, যখন আমার মনে আল্লাহর স্মরণ চলে আসে, আমি আল্লাহকে স্মরণ করতে থাকি তখন বুঝে নেই যে, আল্লাহ আমাকে স্মরণ করছেন আর সেটারই প্রতিধ্বনি ও প্রতিবিম্ব আমার মনের উপর প্রতিফলিত হচ্ছে; ফলে আমিও আল্লাহকে স্মরণ করছি। কাজেই মূল ব্যাপারটি আল্লাহর তরফ থেকেই হয়। আল্লাহ তা'আলা প্রথমে তাওফীক দিয়েছেন, কবুল করেছেন তারই প্রতিক্রিয়ায় আমরা এখানে বসে আছি। এটা আল্লাহর খাছ মেহেরবানী।

এ জাতীয় মাহফিলে বসতে পারা অনেক বড় ইবাদত। এই মাহফিলকে নিয়ে আল্লাহ তা'আলা ফেরেশতাদের মাহফিলে গর্ব করছেন। ফেরেশতাদের মাহফিলে কখনো গুনাহগারদেরকে নিয়ে গর্ব করা হয় না। কাজেই বোঝা গেল, আল্লাহ তা'আলা প্রথমে আমাদেরকে মাফ করে দিয়েছেন তারপর গর্ব করছেন।

আমের গুটি যেমন গাছের সঙ্গে লেগে থাকলে বাড়তে থাকে, বড় হয় এবং একসময় পাকে ও দামী হয় তেমনিভাবে যারা দীনী মেহনতে জুড়ে থাকে, লেগে থাকে তাদের রুহানী তারাক্কী হতে থাকে। আল্লাহর প্রতি ও রাসূলের প্রতি মহব্বত-ভালোবাসা তাদের দিলের মধ্যে বাড়তে থাকে। আমাদের দায়িত্ব হল, নিজেদের দিল ও কলবকে উলামায়ে কেরামের খেদমতে পেশ করা। বাকিটা আমাদের হাতে নেই। কলব হল কোন কিছু নেয়ার ও গ্রহণ করার পাত্র। উলামায়ে কেরাম কলবের পাত্রে রুহানী নেয়ামত বিতরণ করেন। এই নেয়ামত পাওয়ার জন্য যারা নিজেদের কলবকে পেশ করবে, ইনশা-আল্লাহ আল্লাহ তাদের কাউকে মাহরূম করবেন না। তবে ইখলাছের সাথে আসতে হবে; লোক দেখানোর জন্য নয়। লোক দেখানোকে রিয়া বলে। তাই বলে যে কোন লোক দেখানোই কিন্তু রিয়া নয়। আমরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে মসজিদে যাই। লোকেরা আমাদেরকে দেখে। অনেক সময় আমাদের দিলেও এই খেয়াল আসে যে, মসজিদে গেলে অমুক অমুক ভাইয়ের সাথে দেখা হবে। তারাও আমাদেরকে দেখবে– এটা কি রিয়া হয়ে গেল? এটা রিয়া হয় না। আসলে রিয়া হল, আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে মানুষের অন্তরে নিজের বড়ত্বের আকাঙ্ক্ষা করা। যেমন: কেউ ইবাদত করছে আল্লাহর, কিন্তু আকাঙ্ক্ষা করছে যে, যারা আমাকে দেখছে তাদের দিলে আমার বড়ত্ব পয়দা হোক; তারা আমার সম্পর্কে এই ধারণা করুক যে, লোকটা নিশ্চয় কোন বুযুর্গ হবে; সবসময় তাকে ইমামের পিছনে প্রথম কাতারে দেখি, আমি তো পারি না– এই আকাঙ্ক্ষা হল রিয়া। আমল করলে মানুষ তো দেখবেই; নামায পড়লে দেখবে, যাকাত দিলে দেখবে, হজ্জ করতে গেলে দেখবে– তাহলে এসব কি রিয়া হয়ে যাবে? না, রিয়া তো হল ইচ্ছা করে গলদ নিয়ত করার নাম। এটা অনিচ্ছায় হয় না যে, আমি তো রিয়া করি নাই তারপরও এই মুসিবত আমার কাঁধে চেপে বসেছে! বরং রিয়া করতে হলে আপনাকে ইচ্ছাকৃত গলদ নিয়ত করতে হবে। কেউ প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে তাহিয়্যাতুল মসজিদ পড়ছে আর মনে মনে নিয়ত করছে, পিছনের লোকগুলো দেখুক আর বুঝুক, আমি একজন বিশেষ বুযুর্গ। অর্থাৎ তার খালেছ নিয়ত যে, মানুষের অন্তরে তার মূল্য বৃদ্ধি হোক। একটা খালেছ আল্লাহর জন্য, আরেকটা খালেছ বান্দার জন্য।

কাজেই রিয়া নিজে নিজেই কারো কাঁধে চেপে বসে না। বরং ইচ্ছা করে তা পয়দা করতে হয়। মানুষের দিলে বড়ত্ব পয়দা করতে পারলে সবাই তাকে আগে আগে সালাম দিবে, কুরসি ছেড়ে দিবে, হাদিয়া পেশ করবে– মোটকথা অনেক লাভ। দুনিয়াবী লাভের জন্য সে এই রিয়া করছে। যে ব্যক্তি ইখলাছের সাথে আমল করে সে-ও হাদিয়া পায়, তার জন্যও কুরসি ছেড়ে দেয়া হয়। কিন্তু ইখলাছওয়ালা সম্মান পায় বৈধ উপায়ে আর রিয়াকার পায় ধোঁকাবাজি করে। সে আল্লাহওয়ালাদের লেবাস ধারণ করে সম্মান হাসিল করার জন্য। এই ব্যক্তি কোন আল্লাহওয়ালা নয়। একজন আল্লাহওয়ালাদেরকে মহব্বত করে তাদের মত পোশাক পরেন, এটা প্রসংশনীয়। ইনি হাশরের ময়দানে তাদের সঙ্গে থাকবেন।

احب الصالحين ولست منهم
لعل الله يرزقني صلاحا

পক্ষান্তরে আরেকজন শুধু আল্লাহওয়ালাদের সম্মানটুকু পাওয়ার জন্য তাদের মত পোশাক পরেছে। দুনিয়াতে এই লেবাসের বরকতে সে সম্মান পাবে ঠিক; কিন্তু তার আখেরাত বরবাদ হয়ে গেছে। সে তো ধোঁকাবাজি করার জন্য আল্লাহওয়ালাদের ছূরত ধরেছে। মোটকথা দীনের দ্বারা কাউকে ধোঁকা দেয়া যাবে না। দীনের ছূরত ধারণ করে দুনিয়া কামানো যাবে না। দুনিয়া কামাতে হলে দুনিয়ার ছূরতই ধারণ করা হোক। হযরত জালালুদ্দীন রুমী রহ. মসনবী কিতাবে হযরত সুলাইমান আ.-এর যামানার একটা ঘটনা উল্লেখ করেছেন যে, কোন এক গাছে অনেকগুলো পাখি বসে ছিল। পাশের রাস্তা দিয়ে এক বুযুর্গ যাচ্ছিলেন। ঐ যামানায় বুযুর্গরা মোটা কাপড়ের গুদুড়ি পরতেন। গাছের পাখিরা ব্যাকুল হয়ে তাঁকে দেখতে লাগল যে, একজন আল্লাহওয়ালা যাচ্ছেন, তাঁকে দেখে আমরা ধন্য হই! বুযুর্গ লোকটা গাছের কাছাকাছি এসে আচানক গুদুড়ির ভিতর থেকে তীর ধনুক বের করে কিছু তীর ছুড়ে দিল। এতে একসঙ্গে বহু পাখি শিকার হল। বুযুর্গ ব্যক্তি পাখিগুলো কুড়িয়ে নিয়ে গেলেন। কিছু পাখি বেঁচে গিয়েছিল। তারা গিয়ে হযরত সুলাইমান আ.এর কাছে মামলা দায়ের করল যে, অমুক বুযুর্গ আমাদের এতগুলো পাখি হত্যা করেছে, আপনি এর বিচার করে দিন। সুলাইমান আ. বুযুর্গকে ডেকে বললেন, তোমার বিরুদ্ধে পাখিদের এই

নালিশ; কৈফিয়ত দাও? বুযুর্গ বললেন, হুযুর! এই পাখিগুলো তো হালাল, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এগুলো শিকার করার অনুমতি দিয়েছেন! সুলাইমান আ. বললেন, হে পাখিরা! বুযুর্গ যে কৈফিয়ত পেশ করলেন তোমরা তা খণ্ডন করো? পাখিরা বলল, আমাদেরকে শিকার করা হালাল– এই পয়েন্টে আমাদের কোন আপত্তি নেই। আমাদের আপত্তি হল, তিনি আমাদেরকে শিকার করবেন ভালো কথা, তাহলে শিকারীর বেশ ধরেই আসতেন; আমরাও সতর্ক হওয়ার সুযোগ পেতাম। কিন্তু তিনি বুযুর্গের ছূরতে আসলেন কেন? আমরা তো তাঁর সোহবতে ধন্য হওয়ার জন্য নিশ্চিন্ত হয়ে বসে ছিলাম। অর্থাৎ তিনি ধোঁকাবাজি করলেন কেন? বুযুর্গ এর কোন সদুত্তর দিতে পারলেন না। অতঃপর তার শাস্তিবিধান করা হল।

মোটকথা ধোঁকাবাজি করা যাবে না। তাবলীগ করতে গেছেন ভালো কথা, কিন্তু এই নিয়তে কেন যে, তাবলীগে গেলে অনেক ব্যবসায়ীর সাথে পরিচয় হবে, তাদের মাধ্যমে ব্যবসার অনেক লাইন খুলবে? আর পুরনো তাবলিগী হলে আরব টেন্টের খেদমত পাওয়া যাবে, আরবদের সাথে যোগাযোগ হলে হাদিয়া তোহফা হাসিল করার বিরাট রাস্তা খুলবে? এটা দীনের ছুরতে দুনিয়া। আকৃতিতে দীন, কিন্তু বাস্তবে দুনিয়া।

একলোক মনে মনে খেয়াল করছে, আগামী নির্বাচনে সে প্রার্থী হবে। এজন্য মসজিদ, মাদরাসা, এতিমখানায় দেদারসে দান-খয়রাত করছে। খুব চাল-ডাল বিলাচ্ছে। আবার দু'একটা মসজিদও বানিয়ে দিচ্ছে। সব জায়গায় তার প্রশংসা হচ্ছে– অনেক পয়সাওয়ালা দেখেছি, এমন দিল-দরিয়া তো দেখি নাই। এই ব্যক্তি এগুলো করছে নির্বাচনে জেতার জন্য। এটা ইবাদত হবে না বরং গুনাহ হবে। মসজিদ বানানো ইবাদত, তবে করতে হবে আল্লাহর জন্য। কিন্তু এই ব্যক্তি করছে ভোটে জেতার জন্য।

ধোঁকাবাজির কত কিসিম আর রকমফের যে মানুষ আবিষ্কার করেছে! একেকজন ধোঁকাবাজির একেক পদ্ধতি বের করেছে। কিছু লোক তো সারাজীবনই নওমুসলিম থাকে, কখনও পুরানা হয় না। মসজিদে মসজিদে গিয়ে বলে, 'আমি একজন নওমুসলিম, আমাকে সাহায্য করুন।' আরে ভাই! নওমুসলিম হয়েছেন, আপনাকে মুবারকবাদ! আপনি অত্যন্ত মর্যাদাবান। কিন্তু কাজ-কাম করে জীবিকা নির্বাহ করুন। শক্তি-সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও ভিক্ষাবৃত্তি করে কেন নিজেকে মর্যাদাহীন করছেন?

একবার এক নওমুসলিম দাবীদার একই মসজিদে কয়েকবার চাঁদা তুলতে যাওয়ায় মুসল্লীদের সন্দেহ হয়েছে। যাচাই করে দেখা গেল, কিসের নওমুসলিম! সে আগেও মুসলমান ছিল, এখনও মুসলমান।

মোটকথা, ধোঁকাবাজির অনেক ছুরত আছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, من غشّنا فليس منا যে ধোঁকার আশ্রয় নিল সে আমার উম্মত নয়। (মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ১৬৪)

নবীজীর যামানায় কোন কোন লোক একই জামায় দু-দু'টো করে হাতা লাগিয়ে নিতো। নীচের হাতাটা বড় হতো, আর উপরেরটা কিছুটা ছোট। দেখে মনে হতো, একসঙ্গে দু'টি জামা পরেছে। এভাবে তারা সমাজের চোখে সম্মান পেতে চাইতো। লোকেরা ভাবতো, আমরা একটাই যোগাড় করতে পারি না, আর ইনি দেখি একই সঙ্গে দুটো হাঁকিয়েছেন! পরবর্তীতে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা করতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, كلابس ثوبي زور মিথ্যার দুই জামাধারী। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫২১৯) এই সমস্ত ধোঁকা থেকে আল্লাহ আমাদেরকে হিফাযত করুন। আমীন।

ইংরেজরা সরকারী মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে গেছে, এটাও একটা ধোঁকাবাজি। তারা আমাদেরকে বুঝাতে চেয়েছে, তোমরাও এ ধরণের মাদরাসা বানালে অনেক সওয়াব পাবে। এখানে তোমাদের ছেলে-মেয়েরা দুনিয়াও শিখবে, দীনও শিখবে। আসলে এ ধরনের মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করলে কোন সওয়াবও হবে না, আর সেখানে পড়ে কেউ আলেমও হবে না। যেখানে যুবক-যুবতী একসঙ্গে পড়াশোনা করে, মিথ্যা কথা না বললে বেতন তোলা যায় না, নকল না করলে পরীক্ষায় পাশ করা যায় না, মোটকথা এদের সমস্ত কর্মকাণ্ডই ভুল এবং এর ভিত্তিই মিথ্যার উপর। এটা দীনের নামে প্রতারণা, ধোঁকাবাজি। ইংরেজরা বলে গেছে, আর পাবলিক সওয়াবের নিয়তে আলিয়া মাদরাসা বানাচ্ছে। আলিয়ায় পড়ে কী হয়? 'না ঘর কা, না ঘাটকা' দীনের কাজেও লাগে না, দুনিয়ার কাজেও না। মোটকথা, শরীয়তে ধোঁকার কোন অবকাশ নেই।

বেচাকেনার মধ্যেও যে কত রকমের ধোঁকা আছে! কেউ মাপে কম দিচ্ছে, কেউ বাংলাদেশী পণ্যে 'মেড ইন জাপান' সিল মারছে। নানারকম ধোঁকাবাজি চলছে। এগুলোর সবই হারাম। ধোঁকাবাজ রাসূলের উম্মত নয়। এজন্য এব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা উচিত।

আজকাল বদদীন ডাক্তাররা রোগীকে ব্ল্যাকমেইল করে। রোগীর অজ্ঞতা ও অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে অনেক টাকা-পয়সা কামায়। ডাক্তার ভালো করেই জানে যে, বাচ্চা যে পজিশনে আছে তাতে ডেলিভারী নরমালিই হয়ে যাবে; এর জন্য সিজারের কোনও প্রয়োজন নেই। তা সত্ত্বেও সে রোগীর অভিভাবকে রিপোর্ট দিচ্ছে– যদি ৩ ঘণ্টার মধ্যে সিজার না করেন তাহলে বাচ্চাও মারা যাবে, রোগীও মারা যাবে! ডাক্তারের এই রিপোর্টের পর তো বেচারা অভিভাবকের আর করার কিছু থাকে না। নিরুপায় অভিভাবক বাধ্য হয়েই সিজারের সিদ্ধান্ত নেয়। অথচ পুরো ব্যাপারটাই এই বদদীন ডাক্তারের ধান্ধাবাজি।

আর কিছু ডাক্তার তো ব্ল্যাকমেইল না, সরাসরি ডাকাতি করে। দেখা গেছে, রোগীর টেস্টের কোন দরকার নেই, খামোখা দু'পাঁচটা টেস্ট লিখে দেয় এবং সেখান থেকে কমিশন খায়। ডাক্তার তো রোগী দেখা (যার মধ্যে প্রয়োজনে টেস্ট লেখাও অন্তর্ভুক্ত) বাবদ রোগীর কাছ থেকে একবার ভিজিট নিয়েই নিয়েছে, এখন টেস্টের প্রয়োজন হলে তাকে কোথাও পাঠাবে। কিন্তু সেখান থেকে আবার কমিশন খাবে কেন? দেখা গেছে, ডাক্তার যদি ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে কমিশন না নেয় তাহলে টেস্টের বিলও ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ কমে আসে। ডাক্তার কমিশন খেলে যেখানে ১০,০০০ টাকা লাগতো এখন লাগবে মাত্র ৫,০০০ টাকা। এজন্য আল্লাহওয়ালা ডাক্তাররা পারতপক্ষে টেস্ট দেয় না, আর দিলেও কমিশন খায় না। এদের ব্ল্যাকমেইলটা পড়ে ধোঁকাবাজির মধ্যে, আর কমিশন খাওয়া পড়ে ডাকাতির মধ্যে।

সমাজে অনেক কিছু চালু আছে। যার কোনটা পড়ে ধোঁকার কাতারে, আর কোনটা পড়ে ডাকাতির কাতারে। বাংলাদেশের কোন কোন এলাকার বদনাম আছে, তারা বিয়ের আগে ছেলেপক্ষকে মেয়ে দেখায় একটা আর বিয়ের দিন গছিয়ে দেয় অন্যটা– এটা ধোঁকাবাজি। আর ডাকাতি হলো, ছেলেপক্ষ মেয়ের বাপকে শর্ত দেয়, বিয়েতে আমার দুইশ' লোক আসবে। এ ধরনের দাওয়াত সম্পর্কে আল্লাহর রাসূল বলেন, دخل سارقا وخرج مغيرا এই

লোকগুলো চোর হয়ে ঢুকলো আর ডাকাত হয়ে বের হলো। (সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৩৭৪১) খবরদার! মেয়েপক্ষের দাওয়াতে যাবেন না। ছেলেপক্ষ যদি ওলীমার দাওয়াত দেয় সেটা ভিন্ন কথা। কিন্তু এখন তো আমাদের দেশের ওলীমাগুলোও খ্রিস্টানদের তরীকায় হয়। শুনেছি, খিস্টানদের দাওয়াতে ফ্রি খাওয়ানোর কোন ব্যবস্থা নেই। তারা বন্ধু-বান্ধবদের দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানোর পর তাদের হাতে একটা বিল ধরিয়ে দেয় যে, মেহমানদারী বাবদ আপনার এত টাকা বিল এসেছে, পেইড করে যাবেন। আরো আশ্চর্য হবেন, স্বামী স্ত্রী রেস্টুরেন্টে একসঙ্গে খাওয়ার পর স্বামীর বিল দেয় স্বামী, আর স্ত্রীর বিল স্ত্রী! এমনকি এ-ও শোনা গেছে, মা-বাবা রেস্টুরেন্টে গিয়ে খানা খাচ্ছে আর তাদের কন্যাটি না খেয়ে চুপচাপ তাদের খাওয়া দেখছে। কারণ ওর কাছে তখন খাওয়ার পয়সা নেই! ও খেলে বিলটা কে দেবে? যাহোক, তারা দাওয়াত খাওয়ানোর পর বিল ধরিয়ে দেয়, আর আমাদের দেশে কী হয়? ওলীমা অনুষ্ঠানের প্যান্ডেলের দোরগোড়ায় একটা টেবিল পাতা থাকে। সেখানে দু'এক জন লোক রেজিস্টার খাতা নিয়ে বসে থাকে। তাদের কাজ হল, আপনি কী নিয়ে ওলীমা খেতে এসেছেন- আংটি, ঘড়ি, চুড়ি, নাকি হার তা লিখে রাখা। যেন 'কিরামান কাতিবীন' সাহেবেরা আপনার হাদিয়ানামা লিপিবদ্ধ করে রাখছে। আপনি খানা খেলেন দুইশ' টাকার আর দিতে হল পাঁচ হাজার টাকা। এটা ডাকাতিও হল সুদখোরিও হল। এর চেয়েও জঘন্য ব্যাপার হল, কোন কোন এলাকার কথা শোনা যায়, সেখানে আল্লাহর কোন বান্দা যদি লেনদেনমুক্ত ওলীমার আয়োজন করে তখন অনেকেই সে দাওয়াতে শরীক হয় না। উপরন্তু বলাবলি করে যে, 'ফয়তার দাওয়াতে আবার কে যায়?' অর্থাৎ কেউ হিম্মত করে সুন্নাতের অনুসরণ করলে তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয়। আল্লাহর পানাহ! আমরা এসব কী করছি! আসল কথা হল, আমরা অনেকেই এখন كلب الدنيا (দুনিয়ার কুকুর) হয়ে গেছি। আমাদের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে তো ইসলামের কোনও সম্পর্ক নেই। ইসলাম কোথায় আর আমরা কোথায় ?

বুযুর্গানে মুহতারাম! আমাদের ভুলের কোন শেষ নেই। ছেলে-মেয়ে বালেগ হয়ে গেলে পিতা-মাতার দায়িত্ব, দীনদার পাত্র-পাত্রী দেখে বিয়ে দিয়ে দেয়া। ছেলেদের দাড়ি গজানোর দ্বারা আর মেয়েদের মাসিক শুরু হওয়ার দ্বারা পিতা-মাতাকে বুঝানো হয় যে, ছেলে-মেয়ের বিয়ের বয়স হয়ে গেছে, আর দেরি করা যাবে না। এজন্য বালেগ হওয়ার দু'এক বছরের মধ্যেই ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিতে হবে। যদি না দেয়, আর ছেলে-মেয়ে কোন গুনাহ করে, কুদৃষ্টি করে, অন্য ছেলে-মেয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, প্রেমপত্র লিখে, ইন্টারনেটে নোংরা ছবি দেখে, তাহলে গুনাহের দায়দায়িত্ব পিতা-মাতার উপর বর্তাবে। আল্লাহর রাসূল বলে গেছেন, পিতা-মাতার উপর সন্তানের হক হল, সুন্দর নাম রাখা, আকীকা করা, দীন শিক্ষা দেয়া, বালেগ হয়ে গেলে বিয়ের দিয়ে দেয়া। (কিতাবুল বিররি ওয়াস্ সিলাহ; হা.নং ১৫৫)

বিয়ে-শাদী দেয়ার পর সন্তানের চারিত্রিক পদস্খলনের ব্যাপারে পিতা-মাতা অনেকটাই দায়মুক্ত।

অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, এদেশে যত এন.জি.ও. আছে সব ইয়াহুদী খ্রিস্টানদের অর্থে পরিচালিত। এরা সরকারকে দিয়ে একটা আইন পাশ করিয়েছে যে, ১৮ বছরের আগে কোন মেয়ের বিয়ে দেয়া যাবে না। তাদের ভাষায় এটা হল বাল্যবিবাহ। অথচ মেয়েরা সাধারণত আরো চার/পাঁচ বছর আগেই বালেগা হয়ে থাকে। তখন বিয়ে দিলে তো এতদিনে সে মা হয়ে যেতো। মাঝখানে প্রধানমন্ত্রী একবার বলেছিলেন, এই আইনটা ১৬ বছরে করা হোক। কারণ মেয়েরা এতোটা সময় (১৮ বছর) বসে থাকে না। পারিপার্শ্বিকতাসহ বিভিন্ন কারণে তাদের পক্ষে চারিত্রিক পবিত্রতা ধরে রাখা সম্ভবপর হয় না। বন্ধু-বান্ধবের হাত ধরে চলে যায়, নানা অঘটন ঘটায়। কিন্তু এনজিওদের হৈচৈয়ের কারণে সেটা আর সম্ভব হয়নি। এনজিওরা এই আইনটি পাশ করিয়েছে মূলত যিনা-ব্যভিচারকে ব্যাপক করার জন্য। এর জন্য তারা মুড়ি-মুড়কির মতো দেদারসে জন্মবিরতিকরণ ট্যাবলেটও সাপ্লাই দেয়। এর পরও কোন মেয়ে যদি বিপদে পড়ে যায়, পেটে অবৈধ সন্তান চলে আসে– এর জন্য তারা 'মেরী স্টোপস' প্রতিষ্ঠা করেছে। মুসলমানরা মনে করেছে, আমাদের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য সরকার কত রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এত রাস্তাঘাট, ফ্লাইওভার দেখে অনেকে খুশি হয়ে গেছে। অথচ আশংকা আছে! এগুলো আপনার আমার জন্য নয়। খুব তাড়াতাড়িই আপনার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য কোন কুফরী শক্তি ক্ষমতায় আসবে, আর তাদের সুবিধার জন্য এগুলো প্রস্তুত করা হচ্ছে!

এনজিওরা এক ভুত খাড়া করেছে যে, ১৮ বছরের আগে বিয়ে দেয়া যাবে না। আর বাপ-মা খাড়া করেছে দুই ভুত। এক ভুত হল, দেখা যাচ্ছে তাদের প্রাপ্তবয়স্ক ছেলেটি বন্ধু-বান্ধবদের মাধ্যমে প্রস্তাব দিচ্ছে, আব্বা! আমি গুনাহ থেকে বাঁচার জন্য বিয়ে করার দরকার মনে করছি। আর বাপ মা বলছে, তোর এখনো পড়াশোনাই শেষ হয়নি, বিয়ে করে বউকে খাওয়াবি কোত্থেকে? কেন, সে কি পড়াশোনার পাশাপাশি দু'একটা টিউশনি করে কিছু রোজগার করতে পারবে না? যদি না-ও পারে তাহলে আপনার প্রিয় রাসূল তো বলেই গেছেন, طعام الواحد يكفي الإثنين একজনের খাবার দু'জনের জন্য যথেষ্ট। দু'জনের খাবার তিনজনের জন্য যথেষ্ট। (মুসলিম, হাদীস নং ২০৫৯) আপনার ফ্যামিলিতে দু'চারজন সদস্য অবশ্যই আছে। আরেকজন আসলে কি তার জন্য ব্যবস্থা হবে না? অবশ্যই হবে। তো পড়ালেখা শেষ হওয়ার দরকার নেই। বালেগ হলেই বিয়ে দিয়ে দেন, রিযিকের মালিক আল্লাহ।

বাপ মা আরেক ভুত খাড়া করেছে যে, এক ছেলে দীনদার, তাবলীগওয়ালা, আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে যায়। সে বিয়ে করতে চায়, কিন্তু সিরিয়ালে সে তিন নম্বরে। অর্থাৎ তার আগে আরও দু'জন রয়ে গেছে; যারা দীন-ধর্ম মানে না, সারাদিন মেয়েদের সাথে আড্ডাবাজি করে, বিয়ের নামও নেয় না। তখন বাপ মা বলে, আরে! তোর আগে আরও দুইজন রয়ে গেছে না! তাদেরকে বাদ দিয়ে তোকে বিয়ে করাব কিভাবে? সিরিয়াল মতো আয়। ভাই! শরীয়তে কোন সিরিয়াল নেই। যার যখন পাত্র-পাত্রী পাওয়া যাবে, বিয়ে দিয়ে দিতে হবে। এর বড় দলীল হল, হযরত মূসা আ. যখন ফেরাউনের রাজত্ব থেকে সঙ্গোপনে হযরত শুআইব আ.-এর দেশে হিজরত করলেন। আর শুআইব আ. তার কন্যাদের কাছ থেকে হযরত মূসা আ.-এর দীনদারির কথা শুনলেন যে, আসার সময় কন্যারা যখন তার আগে আগে চলে তাকে রাস্তা দেখাচ্ছিল তখন মূসা আ. তাদেরকে বলেছেন যে, তোমরা আমার পেছন পেছন আসো এবং পেছন থেকেই রাস্তা বাতলে দাও।

(৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইস্তিগফারের অফুরন্ত ফযীলত

[ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান রহ. প্রদত্ত বয়ান থেকে সংগৃহীত]

হামদ ও সালাতের পর...

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে যত ভালো কাজ শিক্ষা দিয়েছেন, তাতে কমপক্ষে তিনটি উপকার নিহিত আছে। উদাহরণত একবার দুরূদ শরীফ পড়লে তিনটি উপকার পাওয়া যায়। দশটি নেকী লাভ হয়, দশটি গুনাহ মাফ হয় এবং দশটি দরজা বুলন্দ হয়। দুরূদ শরীফ বেহ্তেরীন ইবাদত। ইস্তিগফার আমাদের কাছে খুব হালকা-পলকা লাগে। এটাও বেহতেরীন ইবাদত। হাদীস শরীফে বিভিন্ন তরীকায় ইস্তিগফারের শব্দাবলী বর্ণিত আছে। যেমন,

- استغفر الله ربى من كل ذنب و اتوب إليه
- استغفر الله الذى لا اله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
- أللهم اغفر لى وارحمني

এগুলো সবই ইস্তিগফারের শব্দ। ইস্তিগফার দুরূদ শরীফের মতই বেহতেরীন ইবাদত। দু'আ কবুল হওয়ার জন্য দুরূদ শরীফ একটা বড় উসিলা। দুরূদ শরীফ পড়ে দু'আ করলে তা কবুল হয়। অনুরূপভাবে ইস্তিগফারও দু'আ কবুল হওয়ার বেহতরীন উপকরণ। দুরূদ শরীফ পড়লে যেমন তিনটি ফায়দা হয়, ইস্তিগফার পড়লেও তিনটি ফায়দা হয়। তবে দুরূদ শরীফ পড়ার ফায়দাগুলো বাকি; নগদ না। দশটা নেকি পাবেন, এগুলো আমলনামায় লেখা হবে; কিয়ামতের দিন দেখানো হবে। দশটা গুনাহ মাফ হয়ে যাবে, এটাও ঠিক ঐরকম। দশটা দরজা বুলন্দ হয়ে সম্মানিত হবেন, এটা বেহেশতের মধ্যে দেখা যাবে। দুরূদ শরীফের খায়ের ও বরকত বাকি। নগদও আছে। একেবারেই নেই তা নয়।

আর ইস্তিগফারের সব ফায়দা নগদ নগদ। দুরূদ শরীফের মতো কিছু বাকি কিছু নগদ এমন নয়। কাজেই ইস্তিগফার পড়ে সঙ্গে সঙ্গে ফায়দা লুটে নাও। তবে ইস্তিগফার পড়লে যে নগদ তিনটা ফায়দা পাওয়া যাবে সেটা শর্তবিহীন নয়। সুতরাং কোনও রকমে ইস্তিগফার পড়ে নিলেই কাঙ্ক্ষিত ফায়দা হাসিল হবে না। হাদীসের শব্দ হলো- من لزم الإستغفار অর্থাৎ যে ঈমানদার বান্দা ইস্তিগফারকে আবশ্যক করে নিয়েছে। উঠতে-বসতে চলতে-ফিরতে সব সময় সে ইস্তিগফার পড়ে। من لزم الإستغفار মানে যার যবান ইস্তিগফার থেকে মুক্ত হয় না, ইস্তিগফারের সঙ্গে তার যবান লেগে থাকে। এই রকম ইস্তিগফারকারীর জন্য তিনটি নগদ ফায়দা আছে।

ইস্তিগফারকারীর প্রথম ফায়দা : من كل هم خرج অর্থাৎ ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে যত রকমের দুশ্চিন্তা আছে সকল দুশ্চিন্তা আল্লাহ তা'আলা দূর করে দিবেন। ইস্তিগফারকারীর কোনো রকমের চিন্তা-দুশ্চিন্তা থাকবে না; সব দূর হয়ে যাবে।

কিছুদিন ধরে একজন বড় আলেম আমাকে বিরক্ত করছে। টেলিফোনে কান্নাকাটি করে। আমার কাছে পরামর্শ চায়। আরে, আসামীর তালিকায় তো আমার নামও আছে। সে মনে করছে, হুযূর এমন নিশ্চিন্ত হয়ে কীভাবে বসে আছে? নিশ্চয় হুযূরের কোনো উসিলা আছে, লাইন-ঘাট আছে! আমি তাকে বললাম, ভাই! তোমার যে অবস্থা আমারও সেই অবস্থা। তুমি গা ঢাকা দিবে কোথায়। কতদিন দিবে। পড়া-পড়ানো তো নষ্ট হবে। এতে চিন্তা বাড়বে বৈ কমবে না। চিন্তা কেন করছো? পড়া-পড়ানো চালিয়ে যাও আর খুব ইস্তিগফার করো। ইস্তিগফার তো করবে, কিন্তু খুব একীন সহকারে করতে হবে। এই তো হাদীসের লফয جعل الله له من كل هم خرج খুব এক্বীন করে পড়তে থাকবে। শুয়ে বসে সর্বাবস্থায় পড়। সে ভাবছে, হুযূর এতো নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছে কেন? আরে! দুশ্চিন্তা করলে লাভটা কী হবে। কজেই নিশ্চিন্তে বসে থাকা ছাড়া উপায়ও তো নেই। হযরত আশরাফ আলী থানবী রহ. বলেন, তুমি আল্লাহর নিকট খুব দু'আ করো। দু'আর মধ্যে দু'টি লাভ। একটা নগদ, একটা বাকি। নগদ লাভ হল, দু'আর বরকতে তৎক্ষণাৎ পেরেশানী দূর হয়ে যাবে। আর যে জিনিসের জন্য দু'আ করছো এই জিনিস হয় দুনিয়াতেই পেয়ে যাবে নতুবা আখিরাতে পাবে। সুতরাং খুব দু'আ করতে থাকো। তোমার দুশ্চিন্তা দূর হয়ে যাবে। এর জন্য বেশি বেশি দু'আ করো আর ভালো করে ঘুমাও। কিন্তু ঘুম আসলে তো ঘুমাবে!

পরশু একজন মাওলানা এসেছিল। এখানে বসুন্ধরা মারকাযে নাকি অনেক বছর পড়েছে। এখন মা-শা-আল্লাহ দাওরায়ে হাদীস মাদরাসায় পড়ায়। আমাকে খতমে বুখারীতে নেয়ার জন্য এসেছিল। হেলিকপ্টারে করে নিয়ে যাবে। আমি বললাম, ভাই! দেশের অবস্থা খুব একটা ভালো না। এখন এত বড় প্রোগ্রাম করো না। অন্যান্য বছরের মতো সাদাসিধে আয়োজন করে ফেলো। ইনশা-আল্লাহ আমি আগামী বছর যাবো। সে মনে করেছে, আগামী বছর হুযুর বাঁচলে তো? তো আমি বলছি, ইনশা-আল্লাহ আমি মরবোও না। আল্লাহ কবুল করুন, আমীন। তাদেরকে এতো করে বললাম, তারপরও মানল না। শেষ পর্যন্ত তাদের পীড়াপীড়ির কারণে রাজি হলাম। ১৪ তারিখ এখান থেকে হেলিকপ্টারে যাবো মাগুরা। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে আবার খুলনায়। দুই দিন পর প্লেনে ঢাকায় ফিরবো। গতকাল রাত পৌনে তিনটায় আমার মোবাইল বাজছে। তখন কোন কারণে আমি হাম্মামে। রাতে জরুরত সারতে বারবার উঠতে হয়। একা একা উঠতে পারি না। কেউ আমাকে হাম্মামে পৌঁছে দিতে হয়। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। তারা নিজেরাও তো ঘুমাতে পারে না। আর আমি তো মাজবূরান ঘুমাতে পারি না। কিন্তু ওরা এই মাজবূরিতে সহযোগিতা করে বলে ঘুমাতে পারে না। মাঝে মাঝে ওদেরকে বলি, তোমরা আরো কয়েকজনকে নিয়ে খেদমত করো। যা হোক, রাত পৌনে তিনটার সময় আমি হাম্মামে, এদিকে মোবাইল বাজছে। মোবাইল সাধারণত আমি ধরি না। আজকে যখন হাম্মাম থেকে বের হলাম, তো আমাকে যে হাম্মাম থেকে আনা-নেয়ার খেদমত করছিল তাকে বললাম, একটু বসো, মোবাইলটা ধরি। রিসিভ করলাম। ওপাশ থেকে বলল, হুযুর! আমি অমুক বলছি। সেই দুই মাওলানার একজন। বললাম ব্যাপার কি? এতো রাতে ফোন? বলল, হুযূর সারারাত ঘুমাতে পারিনি।

তাহাজ্জুদ পড়ে জেগে আছেন মনে করে ফোন দিলাম। কি ব্যাপার? বলল, মাগুরার মাদরাসাগুলো সব বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। পুলিশ হয়রানি করছে। আমি বললাম, ভাই! আমি তো আগেই বলেছিলাম এ বছর প্রোগ্রাম করো না।

তো বলছিলাম যে, আমরা কিভাবে ঘুমাবো, সারারাত ঘুম ধরে না? নানা রকম চিন্তা-দুশ্চিন্তায় ঘুম ধরে না। আমার তো হাম্মামের জরুরতের কারণে রাতে কয়েকবার উঠতে হয়। জরুরত সেরে আবার ঘুমাতে যাই, ঘুম এসেও যায়। শোয়ার সাথে সাথেই ঘুম এসে যায়। আলহামদুলিল্লাহ চিন্তাও নেই, দুশ্চিন্তাও নেই। যা হওয়ার তাতো হবেই। এটার জন্য মেহনত করি। এমন কোন দিন যায় না যেদিন কয়েক শতবার ইস্তিগফার না পড়ি। পড়তে থাকি। যখনই সুযোগ পাই ইস্তিগফার পড়ি। যে কোন শব্দে পড়ি। বড় ইস্তিগফারও পড়ি, ছোটও পড়ি। পড়তেই থাকি। আল্লাহর রহমতে এর কিছু বরকত নগদেই পাচ্ছি। বেশি বেশি ইস্তিগফার পড়তে থাকো বরকত তুমিও পাবে। চিন্তা-দুশ্চিন্তা থেকে আল্লাহ তোমাকে নাজাত দিবেন। من كل هم مخرج এর চেয়ে বড় নিয়ামত দুনিয়াতে আর কিছু নেই। মানুষের ঘুম আসে না। বিশেষ করে এই বয়সে। হাটহাজারীর আল্লামা শফী সাহেব বগুড়ায় বয়ান করেছেন। বলেছেন, 'আমার বয়স প্রায় নব্বই বছর, আর পাশে বসা সভাপতি সাহেব (মুফতী আব্দুর রহমান সাহেব) আমার চেয়েও বয়সে বড়। হুযূরের বয়স কত বেশি জানি না। যা হোক, কেউ ৯২ বলে আবার কেউ বলে ৯৩। তো এই বয়সে ডাক্তাররা আমাকে জিজ্ঞেস করে আপনার ঘুম কেমন হয়? বলি, প্রয়োজনে ঘুম দূর করার ট্যাবলেট দিতে পারেন, ঘুম আসার জন্য ওষুধের প্রয়োজন নেই।' আমার ঘুমের অবস্থাও এমনই। শোয়া মাত্রই ঘুম এসে যায়। ডাক্তাররা বলে, মা-শা-আল্লাহ তাহলে তো খুব ভালো। আমি বলি, ভালোর কারণ হল, আমার কোন চিন্তা-দুশ্চিন্তা নেই। আমার কোন ব্যবসা নেই যে লোকসান হয়ে যাবে। কোন জমি-যিরাত নেই যে বন্যায় ডুবে যাবে। আর কোন বেতনও নেই যে কাটা যাবে। তো আমার চিন্তা কিসের? প্রশ্ন করতে পারো তাহলে খাবেন কোত্থেকে? আরে ঐ চিন্তা তো আরো নেই। পেলে খাবো, না পেলে খাবো না। এই বয়সে বেশি খাওয়া যায় নাকি? এখন শুধু ঘুম আসে। তো 'পেলে খাবো, না পেলে খাবো না' তোমরা এটা ভালো করে রপ্ত করে নাও। পেলে খাবে, না পেলে খাবে না। তবে ঘুমটা যেন ভালো করে হয়। দুনিয়াতে ঘুমের চেয়ে বড় কোন নেয়ামত নেই। আমাদের এখানকার যে সব লোক সৌদি আরব যায়, দুবাই যায়– এরা ফজরের নামায পড়েই ঘুমিয়ে পড়ে। একঘুমে এগারোটা বাজিয়ে দেয়। নাস্তা-টাস্তাও করে না। খালি ঘুমায়। মানে হল, ঘুম তাদের কাছে অনেক বড় নেয়ামত। তোমরা তো এখন পড়া-শোনা করছো। আলহামদুলিল্লাহ, যে পরিমাণ ঘুম তোমাদের হচ্ছে এটা আল্লাহর নেয়ামত। যদি দুশ্চিন্তায় ভুগো, চিন্তা-ভাবনায় পড়ে যাও তাহলে ঘুম ধরবে না। এই বয়সেই যদি ঘুম না আসে কিছুদিন পর তো ঘুমের জন্য ট্যাবলেট খেতে হবে। ট্যাবলেট খাওয়ার পর যে ঘুম আসে সেটা কিন্তু নেয়ামত না। জবরদস্তি ঘুমকে কিভাবে নেয়ামত বলা যায়? এজন্য আল্লাহর কাছে দু'আ করো যেন ট্যাবলেট ছাড়াই ঘুম আসে। খুব ঘুমাও, কোন অসুবিধা নাই। ইবাদতের মধ্যে বেহতেরীন ইবাদত হল ঘুমানো। কারণ জাগ্রত অবস্থায় সাধারণত ইবাদত-বন্দেগী হয় না। তবে আল্লাহ যাদেরকে তাওফীক দেন তাদের হয়। জাগ্রত অবস্থায় গুনাহ হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। গীবত, শেকায়েত, বদগুমানী এগুলো জাগ্রত অবস্থায় হয়। জাগ্রত অবস্থায় যে সব গুনাহ হয় এগুলো থেকে বেঁচে থাকার জন্য মেহনত করতে হবে। এই মেহনত যারা করবে আল্লাহ হয়তো জাগ্রত অবস্থায়ও তাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখবেন। অন্যথায় বেহতেরীন ইবাদত হলো ঘুমিয়ে থাকা। ঘুমের মধ্যে কোন গুনাহই নেই। কথার কথা, ঘুমের মধ্যে বিবিকে তালাক দিলেও কার্যকর হবে না। যদি কুফুরী কালিমাও বলে ফেলো কোন গুনাহ নেই; ঈমান নষ্ট হবে না। তাহলে বোঝো ঘুম কতো বড় ইবাদত! এই ইবাদতে কোন রকমের অসুবিধা নেই। এমনকি ঘুমের মধ্যে যদি ফরয নামাযের ওয়াক্তও চলে যায় কোন গুনাহ হয় না। ঘুম যে কত বড় নেয়ামত ও ইবাদত তা বোঝানোর জন্য মাসআলা বললাম। এর অর্থ এই নয় যে, তুমি ইচ্ছা করেই নামাযের সময় ঘুমিয়ে থাকবে। নামাযের জন্য জাগ্রত হওয়ার ইচ্ছায় তুমি ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রাখলে। কোন কারণে অ্যালার্ম বাজল না বা অ্যালার্মের শব্দেও তোমার ঘুম ভাঙল না এবং কেউ তোমাকে জাগিয়েও দিল না, এদিকে ফরয নামাযের ওয়াক্ত চলে গেল। তো এতে তোমার কোন গুনাহ নেই। তবে তোমাকে সতর্ক থাকতে হবে, যেন ঘুম এতোটা লাগামহীনও না হয়ে যায়, যাতে জরুরী কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটে। আমার বলার উদ্দেশ্য হল ঘুম অনেক বড় ইবাদত। নফল ইবাদত। এই রকম ঘুম কোন ঔষধ ছাড়াই তোমার আসবে ইনশা-আল্লাহ। তুমি চিন্তা এবং দুশ্চিন্তা মুক্তও হয়ে যাবে। তবে এর জন্য তোমাকে একটি মাত্র আমলের পাবন্দি করতে হবে। তা হলো 'কাছরাতে ইস্তিগফার' বা অধিকহারে ইসতিগফার পাঠ। এতটুকু পুরস্কার পেয়ে গেলে তোমার জিন্দেগী কামিয়াব।

এরপর দ্বিতীয় ফায়দা ও পুরস্কার দিচ্ছেন আল্লাহ তা'আলা– ومن كل ضيق مخرج জীবনে যত রকমের তংগি ও সঙ্কীর্ণতা আসবে, যত রকমেই তোমার রাস্তা সবদিক থেকে খাটো হয়ে আসবে, শত্রুরা খাটো করে দিবে, দুশমনরা খাটো করে দিবে– তখনও আল্লাহ তা'আলা তোমার জন্য রাস্তা কোশাদা করে দিবেন, প্রশস্ত করে দিবেন। ومن كل ضيق مخرج অনেক সময় মনে হয়, আর বুঝি দুনিয়াতে থাকার অবস্থা নেই। কিন্তু হঠাৎ করে দেখা যায় কোত্থেকে আল্লাহর কোন বান্দা এসে উদ্ধার করে দিয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের পুরস্কার আল্লাহর বান্দারা পায়। তাহলে তুমি পাবে না কেন? তারা পায় কোন আমলের বিনিময়ে? কাছরাতে ইস্তিগফারের কারণে।

তৃতীয় ফায়দা : ورزقه الله من حيث لا يحتسب অধিক পরিমাণে ইস্তিগফারের কারণে আল্লাহ এই মুমিন বান্দাকে রিযিকের ব্যবস্থা করে দিবেন অকল্পনীয়ভাবে। অর্থাৎ এমনভাবে যা কল্পনাযোগ্য নয়। চাকরি করে ভাত খাবে– এটা আশ্চর্যের কী হল? যে চাকরী করে সে খানা পায়। ইস্তিগফার পড়নেওয়ালাও পায়, না পড়নেওয়ালাও পায়। ব্যবসা-বাণিজ্য করে তুমি রিযিক লাভ করলে, ভাত পেলে, বিরিয়ানি খেলে এতে আশ্চর্যের কী? পক্ষান্তরে তুমি কিচ্ছুটি করলে না, শুধু ইস্তিগফার করতে থাকলে– আল্লাহ তোমাকে এর বিনিময়ে কল্পনাতীত রিযিকের ব্যবস্থা করে দিবেন– এটা হল প্রকৃত বিস্ময়ের ব্যাপার। অবাক লাগে, তোমাদের মত মুখলিসীন তালিবুল ইলম, যারা কেবল আল্লাহকে রাজি করানোর উদ্দেশ্যে মাদরাসায় এসেছো, তোমাদের দাবী অনুযায়ী তোমরা যদি 'কাছরাতে

ইস্তিগফার' করে থাকো তাহলে তোমাদের রিযিকের জন্য কেন আমাদেরকে এতো পেরেশান হতে হচ্ছে এবং তোমরাই বা কেন কষ্ট পাচ্ছো? কল্পনাতীত রিযিক তোমাদের জন্য কেন আসবে না? আমার মনে হয়, কোথাও আমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি হচ্ছে। কোন রুমে অথবা গাড়িতে এয়ার কন্ডিশন চলছে, কিন্তু গাড়ি বা রুম ঠাণ্ডা হচ্ছে না। গাড়ি ঠাণ্ডা হচ্ছে না কেন? ড্রাইভার বলছে, পেছনের জানালাটা একটু ফাঁক হয়ে আছে। ঐ ফাঁক দিয়ে ঠাণ্ডা বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে। আরোহীরা টের পাচ্ছে না। তো তোমরা যদিও কাছরাতে ইস্তিগফার করছো তবুও রিযিক من حيث لا يحتسب আসছে না। বোঝা গেল নিশ্চয়ই কোথাও ছিদ্র রয়ে গেছে। ঐ ছিদ্রটা কিসের? গুনাহের ছিদ্র। কাজেই ইস্তিগফার করার পাশাপাশি গুনাহও ছাড়তে হবে। গুনাহকে গুনাহ মনে না করাও একটা গুনাহ। ওটাও ছাড়তে হবে।

ويرزقه من حيث لا يحتسب এর রিযিক বড় আজীব ও বিস্ময়কর রিযিক। বনি ইসরাইলের জন্য মান্না-সালওয়া এসেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতের জন্য من حيث لا يحتسب আসছে। মান্না-সালওয়া তো من حيث لا يحتسب না। মান্না-সালওয়া প্রতিদিন আসতো। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট পরিমাণে আসতো। কিন্তু ইবরাহীম বিন আদহামের রিযিক হলো من حيث لا يحتسب। তোমরা যখন ইবরাহীম বিন আদহাম রহ.এর তরীকার আনুসারী, তোমরা যদি 'কাছরাতে ইস্তিগফার' করো ইনশা-আল্লাহ তোমার জন্যও من حيث لا يحتسب রিযিক আসবে।

এক গরীব লোক। গায়ে পুরানা কাপড়-চোপড়। মসজিদে ইশার নামায পড়ছে। নামাযের পর মসজিদেই ঘুমাবে। মুয়াযযিন বলল, ভাই আমার সঙ্গে খানা খাও। গরিব লোকটি জিজ্ঞেস করে, কী খানা? বলে, ভাত-সবজি ইত্যাদি ইত্যাদি। লোকটা বলে, আমি তো এগুলো খাই না। তাহলে কী খাও তুমি? বলে, আমি তো বিরিয়ানী খাই, অন্য কিছু খাই না। মুয়াযযিন বলল, ঠিক আছে তুমি তাহলে বিরিয়ানিই খেয়ো! লোকটি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ল। রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হওয়ার পর হঠাৎ এক মহিলা মুয়াযযিনকে ডাকছে– বাবা! আমি বুড়া মানুষ, রান্না করতে দেরি হয়ে গেছে। আমি তোমার জন্য খানা নিয়ে এসেছি। জিজ্ঞেস করা হলো, কী খানা? বলল বিরিয়ানী। মুয়াযযিন বলল, এ খানা আমার না, খানা তো ঐ যে বড় মিয়া শুয়ে আছেন তার। এরপর তাকে ডাক দিয়ে বলল, ও ভাই! তোমার বিরিয়ানি এসেছে, খেয়ে নাও। সে উঠলো। হাত মুখ ধুলো। এবার সে মুয়াযযিনকে ডাকে, ভাই তুমিও আসো, বিরিয়ানী খাও। না, আমি খাবো না। দেখো, আমি একলা সব খেতে পারবো না। আমি যা খাই খাবো বাকিটা কিন্তু থেকে যাবে। সেটা বাসি হলে তো তোমাকেই খেতে হবে, কারণ আমি বাসি খাই না। তুমি আমার সঙ্গে খাও, আর না হয় তোমাকে বাসি খেতে হবে। কি রকম একীন আল্লাহর যাতের উপর! ফাটাফুটা কাপড় আর আল্লাহর যাতের উপর এমন একীন- 'আমি বিরিয়ানী খাই। বাসি খাই না।' শুনতে তো অবাক লাগে। কিন্তু অবাক হওয়ার কী আছে? আল্লাহর ওয়াদা ويرزقه من حيث لا يحتسب আল্লাহ যেহেতু ওয়াদা করেছেন, তুমি অবাক হচ্ছো কেন? আল্লাহর ওয়াদা বাস্তবায়িত হওয়ার জন্য দরকার শুধু মেহনত আর মেহনত। শুধু কাছরাতে ইস্তিগফারের কারণে দুঃচিন্তা চলে যায়। ঘুম বেশি হয়। ঘুম যতো ভালো হবে ততো বেশি খেতে পারবে। তোমার সব দুশ্চিন্তা চলে যাবে। বাধা-বিঘ্ন দূর হয়ে যাবে। অফুরন্ত খানা খুব বেশি করে খেতে পারবে। এরপর আল্লাহর শোকর আদায় করবে- الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. মৌলবী সাব! ওয়াজ মাকসাদ না। তোমরা এসব কিতাবে পড়েছো। এখন এর উপর একীন পয়দা করে আমল করো। নিজের জন্য করো। পরিবারের জন্য করো। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের জন্য করো। নিজের মুহসিনীনদের জন্য করো। আসাতিযায়ে কেরামের জন্য করো। শাইখদের জন্য করো। ইনশা-আল্লাহ গায়েব থেকে আল্লাহ তোমাকে মদদ করবেন। আজকে সারাদেশ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। দেশবাসী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। কওমী মাদরাসাগুলোও কমবেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। সারা বাংলাদেশের অন্যান্য কওমী মাদরাসার তুলনায় আল্লাহ তোমাদেরকে যে শান্তিতে রেখেছেন এর শুকরিয়া আদায় করো। আর বেশি বেশি ইস্তিগফার করে সবার জন্য দু'আ করো। কওমী মাদরাসাগুলোতে ইখতেলাফ থাকতে পারে। যেহেতু সবাই আমরা মানুষ। তবে আমাদেরকে আরও সতর্ক হতে হবে। সামান্য অদূরদর্শিতার কারণে স্বার্থান্বেষী মহলের কারণে আমাদের মাদরাসাগুলিতে মাঝে মাঝে পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটে। পুলিশ হয়রান পেরেশান করে। উস্তাদরা আত্মগোপনে থাকে। আল্লাহ তা'আলা মাদরাসাগুলোকে হেফাজত করুন। তালিবে ইলমদেরকে পড়ালেখার ক্ষতি থেকে বাঁচিয়ে দিন। আমাদের সবার ভুল-ভ্রান্তিগুলো মাফ করে দিন। 'কাছরাতে ইস্তিগফার' করে উক্ত নেয়ামতগুলো হাসিল করার ব্যবস্থা করে দিন। আমীন।

শ্রুতিলিখন : মুর্তাজা রহমান

(৫ পৃষ্ঠার পর; ধোঁকাবাজ ব্যক্তি...)

এতে হযরত শুআইব আ. বুঝতে পারলেন, এ ব্যক্তি ভবিষ্যতে বড় কিছু হবেন। তখন তিনি হযরত মূসা আ.-কে প্রস্তাব পেশ করলেন– দেখ, আমার দুই মেয়ের মধ্যে যাকে তোমার পছন্দ হয় তাকে তোমার সাথে বিয়ে দিব। (সূরা কাসাস- ২৭) দেখুন, তিনি বলেছেন– احدى ابنتيّ هتين 'আমার এই দুই মেয়ের কোন একজন।' একথা বলেননি যে, বড়জনকে বিয়ে দিব। বরং বলেছেন, দুজনের যাকেই তোমার পছন্দ হয়। অথচ আমাদের দেশে সিরিয়ালকে ফরয মনে করা হয়। সিরিয়াল ভেঙে কেউই ছেলেমেয়ের বিয়ে দিতে চায় না। এভাবে সময় মতো বিয়ে-শাদী না দেয়ার কারণে ছেলে-মেয়েগুলো নষ্ট হয়ে যায়, বখে যায়, ইন্টারনেটে যত পাপাচার আছে সেগুলো দেখে দেখে স্বাস্থ্য-মন সব নষ্ট করে ফেলে। এজন্য ছেলে-মেয়েকে গুনাহ থেকে বাঁচান, ইন্টারনেট থেকেও বাঁচান, মোবাইলের ভি.ডি.ও থেকেও বাঁচান। তাদেরকে ইসলামী যিন্দেগী যাপনের সুযোগ করে দিন।

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে স্বচ্ছ জীবন– যে জীবনে কোন ধোঁকাবাজি নেই, ফেরেববাজি নেই, মুনাফেকি নেই, এমন সহজ সরল ও ইখলাছওয়ালা যিন্দেগী যাপন করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

শ্রুতিলিখন : ইসমাতুল্লাহ
ইফতা-প্রথম বর্ষ,
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া,
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

সীরাত পাঠের প্রয়োজনীয়তা, পাঠ পদ্ধতি ও নির্ভরযোগ্য কিছু সীরাত গ্রন্থ

মাওলানা শফীকুর রহমান টাঙ্গাইলী

সীরাত অর্থ– সুন্নাত, পথ, অবস্থা ও পথচলা।

পরিভাষায় সীরাত বলা হয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবনচরিতকে। কারও কারও মতে, সীরাত বলা হয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা, কাজ, মৌন সমর্থন, অবয়ব-আকৃতি, চারিত্রিক গুণাবলী এবং তাঁর আলোকময় জীবন সৌন্দর্যকে– তা নবুওয়াতের পূর্বের হোক বা পরের। (আহাম্মিয়াতুদ দিরাসাহ ১/৩, কাওয়াইদুত তাহদীস; পৃষ্ঠা ৩৫)

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিত পৃথিবীকে যতটা আন্দোলিত করেছিল আর কারো ক্ষেত্রে এর তুলনা খুঁজে পাওয়া যায় না। তার আনীত ধর্মে রয়েছে অর্থবহ ইবাদত পদ্ধতি, মু'আমালা-মু'আশারার সুসংহত কর্মপন্থা। সমাজ ও রাষ্ট্র বিজ্ঞানের উপমাহীন নীতিমালা মানুষকে তিনি শিখিয়েছেন।

মানব জীবনের সূচনা থেকে সমাপ্তি সবক্ষেত্রে রয়েছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উন্নত আদর্শ। তাঁর জীবন-চরিতের চূড়ান্ত গ্রহণযোগ্যতা ও অনুকরণীয় হওয়া এমন কিছু বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রমাণিত, যার সমাবেশ অন্য কারো জীবনেতিহাসে পাওয়া যায় না।

এক. তার জীবনচরিত ছিল ওহীভিত্তিক। কুরআনে এর সুস্পষ্ট প্রমাণ মিলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তিনি নিজ খেয়াল খুশি থেকে কিছু বলেন না। এটা তো খালেস ওহী যা তার কাছে পাঠানো হয়'। (সূরা নাজম- ৩, ৪)

আর যদি সে (অর্থাৎ রাসূল) কথার কথা কোন (মিথ্যা) বাণী রচনা করে আমার প্রতি আরোপ করতো, তবে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম। তারপর তার জীবন-ধমনি কেটে দিতাম। (সূরা হাক্কা- ৪৪-৪৬)

দুই. তাঁর জীবনচরিত সংক্ষিপ্তাকারে সরাসরি কুরআনেও বিবৃত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে, তিনি কি তোমাকে ইয়াতীম পাননি? অতঃপর তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। তোমাকে পেয়েছিলেন পথ সম্পর্কে অনবহিত; অতঃপর তোমাকে পথ দেখিয়েছেন এবং তোমাকে নিঃস্ব পেয়েছিলেন; অতঃপর তোমাকে ঐশ্বর্যশালী বানিয়ে দিলেন। (সূরা দুহা- ৬-৮)

নিশ্চয় তুমি অধিষ্ঠিত আছো মহান চরিত্রে। (সূরা কলাম- ৪)

এভাবে তাঁর জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র ও অবস্থার বর্ণনা কুরআন দ্বারা প্রমাণিত।

তিন. নবী জীবনে রয়েছে মধ্যপন্থা ও সহজসাধ্যতা। বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ির লেশমাত্রও তাতে নেই। প্রান্তিকতামুক্ত এ জীবন যে কাউকে আকর্ষিত করবে নিঃসন্দেহে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি। (সূরা বাকারা- ১৪৪)

চার. একমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনচরিত পরিপূর্ণ ও পরিব্যাপ্ত। পৃথিবীর ইতিহাসে এছাড়া যত নবী-রাসূল ও মহামানবের আগমন ঘটেছে তাদের জীবনের আংশিক শুধু সংরক্ষিত আছে। চলার পথের সবক্ষেত্রে তাদের জীবন থেকে আলো পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে নবী জীবনের শৈশব, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য সব কাল ও সব অবস্থা পুঙ্খানুপুঙ্খ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এ কারণে এই নশ্বর পৃথিবীতে একজন মানুষের ভাবনা, কল্পনা, কথা, সিদ্ধান্ত ও কর্মময় জীবনসংসার কেমন হবে তার পূর্ণাঙ্গ, পরিচ্ছন্ন, পবিত্র ও বিস্তৃত প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে প্রিয় নবীজীর জীবনপাতায়। সবুজ কচি জীবন থেকে শুভ্র প্রৌঢ়ত্ব নাগাদ জীবন পরিক্রমার প্রতিটি ধাপের পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ঘটেছে তাঁর সীরাত তথা জীবনীতে। তাঁর সীরাতে দীপ্তিময় হয়ে ফুটে উঠেছে সমাজ জীবনের সকল নাগরিকের বিচিত্র চিত্র! রাখালের প্রতিকৃতি তিনি, তিনিই কর্মচঞ্চল সওদাগর। জনতার বিশ্বস্ত আমানতদার তিনি, তিনিই সমাজের দরদী সংগঠক। সৌম্য-শান্ত গৃহস্বামী তিনি, তিনিই দয়ার্দ্র জনক। শান্তি সন্ধির কোমলতায় নমিত তিনি, তিনিই অপরাধ দমনে মহাবিক্রমে অস্ত্রধারী। সুশৃঙ্খল জীবনের বিশ্বাসী নাগরিক তিনি, তিনিই শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ঘর্মক্লান্ত রাষ্ট্রপতি। খোদার রাহে প্রাণোৎসর্গ যোদ্ধা তিনি, তিনিই আবার আবদিয়্যতের ভারে কান্না প্লাবিত এক বিনীত বান্দা।

সীরাত পাঠের প্রয়োজনীয়তা

নিম্নোক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে সীরাত পাঠ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য আবশ্যক-

১. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত উম্মতের জন্য উত্তম আদর্শ

আদর্শ বা নমুনার গুরুত্ব অপরিসীম। এ যুগে তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন নেই। আপনি আধুনিক সুবিধা সম্বলিত একটি ভবন নির্মাণ করবেন। এক্ষেত্রে আপনি সাধারণ রাজমিস্ত্রী দ্বারাই কাজটি সম্পন্ন করবেন না। বরং প্রথমে দক্ষ ও অভিজ্ঞ একজন প্রকৌশলীর দারস্থ হয়ে তার থেকে একটি নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ নকশা সংগ্রহ করবেন। এরপর রাজমিস্ত্রীদের সামনে সে নকশা পেশ করবেন। অতঃপর তারা সেই নকশা অনুসরণ করে আপনাকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সমৃদ্ধ একটি ভবন উপহার দিবে। যদি আপনি প্রকৌশলী থেকে নকশা সংগ্রহ না করতেন তাহলে কাঙ্ক্ষিত ভবনটি একদিকে যেমন সাদাসিধে হতো, তেমনি সেটা অনেক সুযোগ-সুবিধা থেকেও বঞ্চিত থেকে যেতো।

আল্লাহ তা'আলা মানুষের জীবন গড়ার জন্য নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক নিখুঁত ও পরিপূর্ণ নকশা হিসেবে জগদ্বাসীর প্রতি প্রেরণ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

অর্থ : তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। (সূরা আহযাব- ২১)

বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী মানবতার আদর্শ নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাতই যদি পাঠ না করা হয় তাহলে কিভাবে তাঁকে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অনুসরণ অনুকরণ করা যাবে!?

২. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত পাঠ ঈমান ও ইত্তিবা -এর দাবী

আল্লাহ রাব্বুল ইয্যত ইরশাদ করেন,

فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.

অর্থ : তোমরা ঈমান আনো আল্লাহর প্রতি ও তাঁর বার্তাবাহক উম্মী নবীর প্রতি, যিনি আল্লাহ তা'আলার ও তাঁর

বাণীর উপর ঈমান রাখেন। (সূরা আ'রাফ- ১৫৮)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.

অর্থ : তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো, রাসূলের আনুগত্য করো এবং সতর্ক হও; যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তবে জেনে রেখো, স্পষ্ট প্রচারই আমার রাসূলের দায়িত্ব। (সূরা মায়িদা- ৯২)

উল্লিখিত আয়াতদ্বয়সহ বহু আয়াত ও হাদীস দ্বারা একথা প্রমাণিত যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর ঈমান আনা এবং তাঁর অনুসরণ, অনুকরণ ও আনুগত্য করা উম্মতের উপর ওয়াজিব। যেটা তাঁর সীরাত পাঠ করা ছাড়া সম্ভব নয়। আর সর্বস্বীকৃত মূলনীতি হল, যে জিনিস ছাড়া ওয়াজিব পূর্ণতা লাভ করে না সেটাও ওয়াজিব হয়ে থাকে। সুতরাং উম্মতের জন্য সীরাত পাঠ করাও ওয়াজিব। (আহাম্মিয়াতু দিরাসাতিস সীরাতুন নববিয়্যাহ ১/১৪)

৩. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত পাঠ কুরআন-সুন্নাহ বোঝার জন্য জরুরী

আল্লাহ তা'আলা মানব জাতির জীবন পরিচালনার দিকনির্দেশনা দিয়ে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। তবে কুরআন সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে এর ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য তিনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দায়িত্ব দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে,

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ.

অর্থ : আমি আপনার প্রতি কুরআন এজন্য অবতীর্ণ করেছি, যাতে আপনি মানুষের জন্য তা খুলে খুলে বর্ণনা করেন। (সূরা নাহল- ৪৪)

আর নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তেইশ বছরের দীর্ঘ নবুওয়াতী জীবনে কথাবার্তা, উঠাবসা, আচার-আচরণ, মৌন সমর্থন এবং চারিত্রিক গুণাবলীর মাধ্যমে উম্মতের সামনে সেই ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। সুতরাং নবীজীর জীবনই কুরআন। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন,

كان خلقه القران.

অর্থ : তাঁর জীবনই কুরআন। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৫৩০২)

সুতরাং কুরআন বোঝার জন্যও সীরাত পাঠ অপরিহার্য।

৪. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত পাঠ গুরুত্বপূর্ণ একটি ইবাদত

বিভিন্ন ইবাদত-বন্দেগী দ্বারা যেমন বিভিন্ন ধরনের সওয়াব লাভ হয়, তেমনি নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত পাঠ করার দ্বারাও আল্লাহ তা'আলার রহমত নাযিল হয়। আর এটা এমন স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শাইখ আবূ আমর ইসমাঈল ইবনে নুজাইদ আবূ জা'ফর আহমাদ ইবনে হামদানকে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি কী নিয়তে হাদীস লিখব? তিনি বললেন, তোমরা কি জান না, নেক লোকদের স্মৃতিচারণ দ্বারা আল্লাহ তা'আলার রহমত নাযিল হয়? আবূ আমর বললেন, জী হ্যাঁ! তিনি বললেন, তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো সমস্ত নেক লোকদের সরদার। (সুতরাং তাঁর স্মৃতিচারণে কি রহমত নাযিল হবে না? অবশ্যই)। (মানহাজুন নাকদ; পৃষ্ঠা ১৯০)

৫. নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত পাঠ আন্তরিক প্রশান্তি লাভের কারণ

হাফেয ইবনুল ইমাদ হাম্বলী রহ. শাযারাতুয যাহাব গ্রন্থে ইমামুদ্দীন ওয়াসেতী রহ. সম্পর্কে লিখেছেন, তিনি কালাম শাস্ত্রবিদ ফুকাহায়ে কেরামের মাঝে বেড়ে উঠেছিলেন। এজন্য তার মাঝে ছিল যুক্তি ও দর্শনের মেজায। কিন্তু একসময় তিনি অনুভব করলেন, তার অন্তরে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই এবং ইয়াকীনের নূর নেই। হৃদয় জুড়ে শুধু দ্বিধা-সংশয় আর অস্থিরতা। তাই তিনি কালাম শাস্ত্রবিদদের পথ ছেড়ে সুফিয়ায়ে কেরামের দ্বারস্থ হলেন। কিন্তু সুফিয়ায়ে কেরামের রংঢং দেখে তিনি আরো বিগড়ে গেলেন। অবশেষে তিনি শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া রহ.এর শরণাপন্ন হয়ে মনের অস্থিরতা খুলে বললেন। ইবনে তাইমিয়া রহ. তাকে অসিয়ত করলেন, সবকিছু ছেড়ে সীরাতে নববীর অধ্যয়নে মনোযোগ দাও; সীরাতে নববীই আত্মার সকল ব্যাধির উপশম। সীরাতে নববীই ঈমান ও ইয়াকীনের চিরন্তন উৎস।

শাইখ ইমামুদ্দীন ওয়সেতী রহ. সীরাত অধ্যয়নে ডুবে গেলেন। হৃদয় জুড়ে যে শূন্যতা, অস্থিরতা বিরাজ করছিল তা দূর হয়ে গেল। তিনি অনুভব করলেন, অন্তর থেকে দ্বিধা-সংশয় সরে গেছে। আন্তরিক প্রশান্তি লাভ হয়েছে। (শাযারাতুয যাহাব ৬/২৪)

ইরানের সুবিখ্যাত সুন্নী-হানাফী সাহিত্যিক ড. যাইনুল আবেদীন রাহনুমা আমাদের দেশের আরেক বিখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক সৈয়দ আলী আহসানকে তার বিখ্যাত রচনা 'পয়গম্বর' গ্রন্থটি উপহার দিয়ে বলেন, একজন মুসলমান সাহিত্যিকের কর্তব্য হচ্ছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনী সম্পর্কে আলোচনা করা এবং অন্তত পয়গম্বরের জীবনভিত্তিক একটি গ্রন্থ রচনা করা। তাহলেই দেখবেন আপনি স্বস্তি পাচ্ছেন। সাহিত্যকর্মে এগিয়ে যেতে সফলকাম হচ্ছেন। আমি 'পয়গম্বর' বইটি লেখার পর খুব শান্তি এবং স্বস্তি অনুভব করছি। আমি আধুনিক যুক্তিবাদী মানুষ; কিন্তু রাসূলের জীবনকথা লিখতে গিয়ে আমি আবেগ চঞ্চল হয়েছি। মনে হয়েছে আমি যেন অলৌকিকদের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। (মাসিক আলকাউসার; এপ্রিল '০৬)

মোটকথা, সীরাত চর্চা, সীরাত গ্রন্থ পাঠ করা ইসলামী জীবন গড়ার পথকে করে সুগম। কুরআন-সুন্নাহকে করে সহজ। ঈমানকে করে সুদৃঢ়, বিশ্বাসকে করে শাণিত, আনুগত্যকে করে অবধারিত, উন্মোচিত করে পরকালের চিন্তার রুদ্ধদ্বারসমূহ, জীবনে বিপ্লব আনে, আন্তরিক প্রশান্তি আনে, সুস্থতা ও পবিত্রতা আনে স্বাভাবিক জীবন যাত্রায়।

সীরাত পাঠের পদ্ধতি

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত কোনো কল্প-কাহিনী, গল্প-উপাখ্যানের মত সাধারণ বিষয় নয় যে, যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই, যেখান থেকে ইচ্ছা সেখান থেকেই তা অধ্যয়ন করা যাবে। বরং নবীজীর সীরাত থেকে কিছু পেতে হলে, কিছু অর্জন করতে হলে পরিপূর্ণ আদব, আন্তরিকতা, পূর্ণ শ্রদ্ধা, ভালোবাসা এবং আলোক অর্জনের প্রত্যাশা নিয়ে তা পাঠ করতে হবে। তাছাড়া নিয়ত বিশুদ্ধ রাখা এবং নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে অধ্যয়ন করা তো অপরিহার্য শর্ত।

নেক নিয়তে সীরাত পাঠ

মাওলানা মনযূর নু'মানী রহ. এক সীরাত মাহফিলে বলেন, এই মুহূর্তে কোন ধরনের রাখ-ঢাক ছাড়া স্পষ্ট বলে দেয়াই ভালো মনে করি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জীবন-চরিত ও তাঁর শিক্ষার ব্যাপারে যে নির্ভরযোগ্য ইতিহাস সংরক্ষিত আছে, আমি নিজে যখন তা অধ্যয়ন করি তখন আমার মনে হয়, আমি যেন তাঁকে, তাঁর সমস্ত ব্যস্ততা ও তাঁর গোটা পরিবেশকে নিজ চোখে দেখছি এবং তাঁর অমীয় বাণীসমূহ নিজ কানে শুনছি। আমি কসম করে বলতে পারি, আমার অনেক বুযুর্গ

ও বন্ধুগণ, যাদের সাথে আমার চলাফেরা ও উঠা-বসা হয়েছে তাদেরকেও এতটা জানি না, যতটা নির্ভরযোগ্য ইতিহাসের মাধ্যমে আমার হাদী ও রাহনুমা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানি। এতে আমার কোন বিশেষত্ব নেই। আপনাদের মধ্যেও যারা নেক নিয়তে তাঁর শিক্ষা ও পবিত্র সীরাত অধ্যয়ন করবে, ইনশা-আল্লাহ তার অনুভূতিও এ-ই হবে। (মাসিক আলকাউসার; এপ্রিল '০৬)

সীরাত অধ্যয়ন বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ থেকে হওয়া জরুরী

সাধারণত লেখকের হৃদয়ের উত্তাপ শব্দের হাত ধরে পাঠকের হৃদয়েও তাপ সৃষ্টি করে। লেখকের কলম, কলব ও জীবন যদি সমান্তরাল হয় তাহলে পাঠকের জীবনও হয়ে ওঠে সতেজ, সরস ও সঙ্গতিপূর্ণ। পক্ষান্তরে লেখকের প্রাণ-সত্তাই যদি হয় সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিরস ও নিষ্প্রাণ তাহলে পাঠকের আর পাওয়ার কী থাকে? হযরত ইবনে সীরীন রহ. বলেন,

ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.

অর্থ : এই জ্ঞান কিন্তু দীন; সুতরাং তোমরা ভেবে দেখো কার থেকে (কেমন লোক থেকে) তা গ্রহণ করছো। (মুকাদ্দামায়ে মুসলিম)

আফসোস! আজ আমরা দুনিয়াবী সাধারণ কোন জিনিস ক্রয় করতে গেলে সবচেয়ে ভালো, নির্ভরযোগ্য কোম্পানীর মানসম্মত দোকান থেকে তা ক্রয় করে থাকি। অন্যথায় দিলটা শান্ত হয় না, আত্মতৃপ্তি লাভ হয় না। অথচ আখেরাতের কোন জিনিস ক্রয় করার ক্ষেত্রে যেখানে যা পাই তা-ই কুড়িয়ে নিয়ে আসি। না আছে বিশুদ্ধতার কোন যাচাই-বাছাই, না আছে প্রমাণ-পঞ্জির আলোকে বিচার-বিশ্লেষণ, আর না আছে লেখকের নির্ভরযোগ্যতার কোন পুছ-পাছ। আরো আফসোসের বিষয় হল, আমরা যারা বিলম্বে দীন পেয়েছি বা দীনদার হয়েছি, তাদের দীনদারীর পূর্বে যেসব জিনিসের সাথে আন্তরিকতা ছিল বা যেসব বিষয়ে তারা অভ্যস্ত ছিল, দীনের মধ্যেও সেগুলো তালাশ করি, এখানেও সেসব বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট থাকি। উদাহরণস্বরূপ, একলোক দীনদারীর পূর্বে গান শুনতে অভ্যস্ত ছিল। গানের সুরের মূর্ছনায় সে আনন্দ লাভ করত। যখন সে দীনদার হয় তখন সে নামাযের কিরাআতে সুর খোঁজে, বক্তার বয়ানে সুর তালাশ করে ইত্যাদি ইত্যাদি। আরেক লোক ভিডিও বা টিভিতে বিভিন্ন নাটক, ছায়াছবি, প্রোগ্রাম দেখতে অভ্যস্ত ছিল। সে লোকটাই যখন দীনদার হয়, তখন সে ঐ টিভি থেকেই ইসলাম শিখতে চায়, দীন পেতে চায়। কিন্তু সেখানে কি প্রকৃত দীন পাওয়া যায়? অনুরূপভাবে অনেক মানুষ যারা ইয়াহুদী খ্রিস্টানদের প্রণীত সিলেবাসে পড়ালেখা করেছে, ইংরেজদের কারিকুলামে জ্ঞান অর্জন করেছে এবং হক্কানী উলামায়ে কেরামের সাথে কোনভাবেই সম্পর্ক রাখেনি, তাদের হৃদয়ে ইংরেজদের মেজায-প্রকৃতি, মহব্বত-ভালোবাসা এমনভাবে বদ্ধমূল হয়েছে যে, এরা যখন একটু বয়স্ক হয়, আখেরাতের কথা মনে পড়ে, হৃদয়ে দীনদার হওয়ার আশা জাগে, তখন তারা সেই ইংরেজদের লেখার ভিতরেই দীন খোঁজে, হিদায়াত খোঁজে। সীরাতের ব্যাপারও এর ব্যতিক্রম নয়। অথচ সেখানে কি আর হিদায়াত পাওয়া যায়? রূহানিয়াতের আশা করা যায়? সেখানে তারা শুধু কাগজের ছোঁয়া পেতে পারে; নববী সীরাতের রঙে উদ্ভাসিত আত্মার পরশ পাবে না। স্থূল বিদ্যার শব্দ গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু আত্মার-রূহানিয়াতের স্পর্শ অনুভব করতে পারবে না।

সীরাতের উৎস

সীরাতের আলোচনা শুধু ঐসব গ্রন্থেই সীমাবদ্ধ নয় যেগুলো সীরাত গ্রন্থ নামে পরিচিত। বরং সীরাতের পূর্ণাঙ্গ অধ্যয়নের জন্য নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো মৌলিক উৎস হিসেবে স্বীকৃত।

১. আল কুরআনুল কারীম

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন,

كان خلقه القران.

অর্থ : নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সীরাত আলকুরআন। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৫৩০২)

সুতরাং সীরাত পাঠের জন্য আলকুরআন হল প্রথম উৎস।

২. হাদীসের কিতাবসমূহ

হাদীসের বিষয়বস্তু যেহেতু নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ব্যক্তিসত্তার সাথে সম্পৃক্ত অর্থাৎ নবীজীর কথা, কাজ, মৌন সমর্থন ইত্যাদি; এজন্য নির্ভরযোগ্য হাদীসের কিতাবসমূহ সীরাতের দ্বিতীয় উৎস।

এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষ নিম্নলিখিত কিতাবগুলো পাঠ করতে পারেন-

১. মিশকাতুল মাসাবীহ।
২. আলআদাবুল মুফরাদ (ইমাম বুখারী রহ.)।
৩. রিয়াযুস সালিহীন (ইমাম নববী রহ.)।
৪. হায়াতুস সাহাবা (মাওলানা ইউসুফ কান্ধলবী রহ.)।
৫. উসওয়ায়ে রাসূলে আকরাম (ডা. আব্দুল হাই আয়েফী রহ.)।

৩. সীরাতের কিতাবসমূহ

১. শামায়েলে তিরমিযী।
২. আসাহ্হুস সিয়ার।
৩. সীরাতুন্নবী (মাওলানা শিবলী নু'মানী ও মাওলানা সুলাইমান নদবী রহ.)।
৪. সীরাতে মুস্তফা (মাওলানা ইদরীস কান্ধলবী রহ.)।
৫. রাহমাতুল্লিল আলামীন (কাযী সুলাইমান মনসুরপুরী)।
৬. নবীয়ে রহমত (মাওলানা আবুল হাসান আলী নদবী রহ.)।
৭. হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স.) সমকালীন পরিবেশ ও জীবন (শাইখুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ তফাজ্জল হোসাইন)
৮. ছোটদের সীরাত সিরিজ [ছোটদের জন্য] (মাওলানা আবু তাহের মিছবাহ)।

৪. ইতিহাসের কিতাবসমূহ

ইতিহাসের কিতাবের গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ সীরাত। নবীজীর সীরাত বাদ দিয়ে ইতিহাস সংকলনের কল্পনাও করা যায় না। তবে এখানে ইতিহাসের কিতাবের কোন তালিকা দেয়া হচ্ছে না দু'টি কারণে-

এক. এসব কিতাবের সীরাতের বর্ণনা শাস্ত্রীয় ভঙ্গিতে লিখিত।

দুই. এগুলোর রেওয়ায়াত ও বর্ণনার ক্ষেত্রে সহীহ-যঈফের যাচাই-বাছাই করা হয়নি।

সুতরাং সাধারণ লোকের জন্য সেগুলো থেকে সীরাত অধ্যয়ন না করাই ভালো। এছাড়া অন্য কোন কিতাব পড়তে চাইলে অবশ্যই কোন আলেমের পরামর্শক্রমে তার তত্ত্বাবধানে পড়ার চেষ্টা করবো। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে সঠিকভাবে নবীজীর সীরাত পাঠ করে দুনিয়া ও আখেরাতে সফলকাম হওয়ার তাওফীক দান করুন। আ-মীন।

লেখক : শিক্ষক,
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া,
আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট,
মুহাম্মদপুর-ঢাকা

জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে প্রণীত

জাতীয় পাঠ্যপুস্তক : এন্টার হিন্দুজম, মাইনাস ইসলাম

মাওলানা মুহাম্মাদ আবূ সাইম

(পূর্ব প্রকাশিতের পর...)

ধর্মনিরপেক্ষতার মোড়কে ধর্মহীনতা বরং ইসলাম বিদ্বেষ

শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন ও নতুন পাঠ্যপুস্তক সংস্কারের ক্ষেত্রে সেক্যুলারিজম তথা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়নকারীরা এটা সগৌরবেই স্বীকার করেন। নতুন পাঠ্যপুস্তকই এর রাজসাক্ষী। সরকার সব সময়ই প্রচারণা চালিয়ে আসছে, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে– সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা এবং যার যার ধর্ম-কর্ম স্বাধীনভাবে মেনে চলতে পারা। কিন্তু এই প্রচারণাটি আসলে প্রতারণাপূর্ণ এবং বুলিসর্বস্ব। কারণ স্কুল-কলেজের পাঠ্যবই থেকে যখন বেছে বেছে ইসলামী বিষয়সমূহ বাদ দিয়ে তদস্থলে হিন্দুবাদের ধারণামূলক লেখা যুক্ত করা হয় তখন স্বভাবতই 'সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা এবং যার যার ধর্ম-কর্ম স্বাধীনভাবে মেনে চলতে পারা'র প্রচারণাটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়। কাজেই খোঁজ করতে হয়, সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা আসলে কী?

মুক্তমনা'র প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত অভিজিৎ রায় লিখেছেন, 'বিতর্ক করতে গিয়ে অনেকের কাছ থেকেই শুনি, সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দের মানে হচ্ছে সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা। এমনকি যারা ধর্ম মানেন না, এবং উদারপন্থী বলে কথিত তাদের অনেকেই ধর্মনিরপেক্ষতাকে এভাবে দেখে। বিষয়টি আলোচনার দাবী রাখে। সেক্যুলার শব্দের মানে কি সত্যিই সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা? রাষ্ট্রীয়ভাবে বাংলাদেশ কিংবা ভারতের মত দেশগুলোতে এখন তাই প্রচার করা হয়। বিভ্রান্তি সে কারণেই। আসলে কিন্তু সেক্যুলারিজম শব্দটির অর্থ সব ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা নয়, বরং এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে একটি মতবাদ, যা মনে করে রাষ্ট্রীয় মূলনীতি থেকে ধর্মকে পৃথক রাখা উচিত। আমেরিকান হেরিটেজ ডিকশনারীতে secularism শব্দটির সংজ্ঞায়ন করা হয়েছে এভাবে– The view that religious considerations should be excluded from civil affairs or public education (একটি মতাদর্শ যাতে ধর্মীয় চিন্তা রাষ্ট্রীয় বিষয়াবলী বা সাধারণ শিক্ষা হতে বিবর্জিত।) এ সংজ্ঞা থেকেই বোঝা যাচ্ছে, ধর্মকে রাষ্টের কাজের সাথে জড়ানো যাবে না– এটাই সেক্যুলারিজমের মোদ্দাকথা। ধর্ম অবশ্যই থাকতে পারে, তবে তা থাকবে জনগণের ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলে প্রাইভেট ব্যাপার হিসেবে; পাবলিক ব্যাপার স্যাপারে তাকে জড়ানো যাবে না।

...আসলে অভিধানে secular শব্দটির অর্থও করা হয়েছে এভাবে– Worldly rather than spiritual। সেক্যুলারিজমের অন্যান্য প্রতিশব্দগুলো হল– worldly, (জাগতিক) temporal (পার্থিব) কিংবা profane (স্রষ্টা বা পবিত্র বিষয়ের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব)। ভালোভাবে খেয়াল করলে বোঝা যাবে, এর অবস্থান ধর্ম কিংবা আধ্যাত্মিকতার দিকে নয়, বরং এর একশ আশি ডিগ্রী বিপরীতে। সেজন্য, সেক্যুলারিজমের বাংলা প্রতিশব্দ অনেকে খুব সঠিকভাবেই করেন 'ইহজাগতিকতা'

...ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটিকে নিয়ে কী নিদারুণভাবে অপব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষের মগজ ধোলাই করা হচ্ছে ভাবা যায় না। নিরপেক্ষ শব্দের অর্থ কোন পক্ষে নয়। ধর্মনিরপেক্ষ শব্দের অর্থও তাই- কোন ধর্মের পক্ষে নয়। অর্থাৎ সমস্ত ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক বর্জিত। secularism শব্দের আভিধানিক অর্থ, একটি মতবাদ, যা মনে করে রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষানীতি প্রভৃতি ধর্মীয় শাসন থেকে মুক্ত থাকা উচিত।'

...ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী তার 'ইহজাগতিকতার প্রশ্ন' প্রবন্ধে লিখেছেন, ধর্মনিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয়, এই কথাটা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পর পরই খুব জোরেসোরে বলা হচ্ছে। কথাটা সত্য বটে আবার মিথ্যাও বটে। সত্য এ দিক থেকে যে, রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা নাগরিকদের এ পরামর্শ দেয় না যে, তোমাদের ধর্মহীন হতে হবে; কিন্তু তা বলে এমন কথাও বলে না যে, রাষ্ট্র নিজেই সকল ধর্মের চর্চা করবে, কিংবা নাগরিকদের নিজ নিজ ধর্ম চর্চায় উৎসাহিত করবে। রাষ্ট্র বরঞ্চ বলবে, ধর্মচর্চার ব্যাপারে রাষ্ট্রের নিজের কোন আগ্রহ নেই, রাষ্ট্র নিজে একটি ধর্মহীন প্রতিষ্ঠান। ধর্মবিশ্বাস নাগরিকদের সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার। রাষ্ট্রের ওই ধর্মহীনতাকেই কিছুটা নম্রভাবে বলা হয় ধর্মনিরপেক্ষতা।'

আমাদের ধারণায় সেক্যুলারিজম ও ধর্মনিরপেক্ষতার যে সংজ্ঞা ও বিবরণ মি. অভিজিৎ রায় লিখেছেন সেটাই সঠিক। অন্যথায় সেক্যুলারিজমে বিশ্বাসী ক্ষমতাসীন সরকার যখন সেক্যুলারিজম ও ধর্মনিরপেক্ষতার দোহাই দিয়ে স্কুল-কলেজের পাঠ্যবই থেকে বেছে বেছে ইসলামী বিষয়সমূহ বাদ দিয়ে তদস্থলে হিন্দুবাদের ধারণামূলক লেখা যুক্ত করেন তখন কিন্তু এমনিতেই সরকারী ব্যাখ্যাটি ধোপে টেকে না। অবশ্য বিশিষ্ট কলামিষ্ট জনাব গৌতম দাস তার 'ফরেন অ্যাফেয়ার্সে ইসলাম বিদ্বেষ' নিবন্ধে সেক্যুলারিজমের যে চর্চিত ও ব্যবহারিক সংজ্ঞা দিয়েছেন সে আলোকে সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার নামে পুস্তক প্রণেতাদের কার্যকলাপ খাঁটি ও যথার্থ। তিনি লিখেছেন, 'ভারতীয় উপমহাদেশে যে সেক্যুলারিজম ধারণা পাওয়া যায়, সেটা আসলে খাঁটি ইসলাম বিদ্বেষ।' (দৈনিক নয়াদিগন্ত, ১৯ জুলাই ২০১৬)

পাঠ্যপুস্তকের সুরতহাল: এন্টার হিন্দুজম, মাইনাস ইসলাম

নতুন পাঠ্যপুস্তকে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবেই ইসলামকে মাইনাস করে তদস্থলে হিন্দুবাদের প্রসার ঘটানো হয়েছে। কি কি বাদ দেয়া হয়েছে এবং পরিবর্তে কি কি সংযোজন করা হয়েছে দেখুন, বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে যাবে।

বাংলা বই থেকে বাদ দেয়া হয়েছে–

১. দ্বিতীয় শ্রেণী : 'সবাই মিলে করি কাজ' শিরোনামে ইসলামের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত।
২. তৃতীয় শ্রেণী : 'খলীফা হযরত আবূ বকর' শিরোনামে ইসলামের প্রথম খলীফার সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত।
৩. চতুর্থ শ্রেণী : 'খলীফা হযরত ওমর' শিরোনামে ইসলামের দ্বিতীয় খলীফার সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত।

৪. পঞ্চম শ্রেণী : নবীজীর বিদায় হজ্জের ভাষণ সংবলিত 'বিদায় হজ্জ' রচনা।
৫. পঞ্চম শ্রেণী : কাজী কাদের নেওয়াজ লিখিত 'শিক্ষাগুরুর মর্যাদা' শীর্ষক কবিতা। যাতে বাদশাহ আলমগীরের মহত্ত্ব তুলে ধরা হয়েছিল এবং শিক্ষক-ছাত্রের পারস্পরিক সম্পর্ক ও আদব-কায়দা কেমন হওয়া উচিত তা বর্ণনা করা হয়েছিল।
৬. পঞ্চম শ্রেণী : 'শহীদ তিতুমীর' শীর্ষক নিবন্ধ। যাতে রয়েছে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার জন্য তাঁর বিসস্ময়কর সংগ্রামের অবিস্মরণীয় ঘটনা।
৭. ষষ্ঠ শ্রেণী : ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ লিখিত 'সততার পুরস্কার' নামক একটি শিক্ষণীয় ঘটনা।
৮. ষষ্ঠ শ্রেণী : মুসলিম দেশ ভ্রমণ কাহিনী– 'নীলনদ আর পিরামিডের দেশ'।
৯. ষষ্ঠ শ্রেণী : মুসলিম সাহিত্যিক কায়কোবাদের 'প্রার্থনা' নামক কবিতা।
১০. সপ্তম শ্রেণী : 'মরু ভাস্কর' নামক শেষ নবীর সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত।
১১. অষ্টম শ্রেণী 'বাবরের মহত্ত্ব' শীর্ষক মোগল বাদশাহ বাবরের উদারতা ও মহত্ত্ব বিষয়ক কবিতা এবং বেগম সুফিয়া কামালের 'প্রার্থনা' কবিতা।
১২. নবম-দশম শ্রেণী : মধ্যযুগের বাংলা কবি শাহ মুহম্মদ সগীরের 'বন্দনা' শীর্ষক ধর্মভিত্তিক কবিতা।
১৩. নবম-দশম শ্রেণী : মধ্যযুগের মুসলিম কবি আলাওলের আল্লাহর প্রসংশা সূচক 'হামদ' কবিতা
১৪. নবম-দশম শ্রেণী : কবি আব্দুল হাকিমের বিখ্যাত 'বঙ্গবাণী' কবিতা।
১৫. নবম-দশম শ্রেণী : কবি গোলাম মোস্তফার শিক্ষণীয় 'জীবন বিনিময়' কবিতা। এটি মোঘল বাদশাহ বাবর ও তার পুত্র হুমায়ুনকে নিয়ে লেখা।
১৬. নবম-দশম শ্রেণী : কাজী নজরুল ইসলামের বিখ্যাত 'উমর ফারুক' কবিতা।

এর বাইরে আরও কিছু লেখাও বাদ দেয়া হয়েছে যার সঙ্গে ইসলামী ভাবধারা, মূল্যবোধ ও নীতি-নৈতিকতার ব্যাপার জড়িত।

এর পরিবর্তে বাংলা বইয়ে প্রবেশ করেছে-

১. পঞ্চম শ্রেণী : স্বঘোষিত নাস্তিক হুমায়ুন আজাদ লিখিত 'বই' নামক একটি কবিতা, যা মূলত মুসলমানদের ধর্মীয় গ্রন্থ কুরআন বিরোধী কবিতা।
২. ষষ্ঠ শ্রেণী : 'বাংলাদেশের হৃদয়' নামক একটি কবিতা। যেখানে রয়েছে হিন্দুদের দেবী দুর্গার প্রশংসা।
৩. ষষ্ঠ শ্রেণী : 'লাল গরুটা' নামক একটি ছোটগল্প। যা দিয়ে মুসলিম শিক্ষার্থীদের শেখানো হচ্ছে গরু হচ্ছে মায়ের মতো, অর্থাৎ হিন্দুত্ববাদ।
৪. ষষ্ঠ শ্রেণী : হিন্দুদের তীর্থস্থান ভারতের রাঁচি'র ভ্রমণ কাহিনী।
৫. সপ্তম শ্রেণী : লালু' নামক গল্পে বাচ্চাদের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে পাঁঠাবলির নিয়ম কানুন।
৬. অষ্টম শ্রেণী : পড়ানো হচ্ছে হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ 'রামায়ণ' এর সংক্ষিপ্তরূপ।
৭. নবম-দশম শ্রেণী : 'আমার সন্তান' নামক একটি কবিতা। কবিতাটি হিন্দুদের ধর্ম সম্পর্কিত 'মঙ্গলকাব্য'র অন্তর্ভুক্ত, যা দেবী অন্নপূর্ণার প্রশংসা ও তার কাছে প্রার্থনাসূচক কবিতা।
৮. নবম-দশম শ্রেণী : ভারতের পর্যটন স্পট 'পালমৌ' এর ভ্রমণ কাহিনী।
৯. নবম-দশম শ্রেণী : 'সময় গেলে সাধন হবে না' শিরোনামে বাউলদের বিকৃত যৌনাচার।
১০. নবম-দশম শ্রেণী : 'সাকোটা দুলছে' শিরোনামের কবিতা দিয়ে ৪৭-এর দেশভাগকে হেয় করা হচ্ছে, যা দিয়ে কৌশলে 'দুই বাংলা এক করে দেওয়া' অর্থাৎ বাংলাদেশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হতে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।
১১. নবম-দশম শ্রেণী : 'সুখের লাগিয়া' নামক একটি কবিতা, যা হিন্দুদের রাধা-কৃষ্ণের লীলাকীর্তন।
১২. প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে দেওয়া হয়েছে 'নিজেকে জানুন' নামক যৌন শিক্ষার বই।

এর বাইরে আরো অনেক লেখাই রয়েছে যেগুলো নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

উদাহরণত ১ম শ্রেণীর 'আমার বাংলা বই'তে অক্ষর পরিচয় করতে গিয়ে ঋষি, ওঝা, হিন্দু ঢাক, হিন্দুদের রথ, বাউলদের একতারা এ টার্মগুলো শেখানো হচ্ছে। চতুর্থ শ্রেণীর 'আমার বাংলা বই'য়ে অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'নেমন্তন্ন' কবিতায় শেখানো হচ্ছে হিন্দুদের ন্যায় 'বাবু' বলে একে অপরকে সম্বোধন করতে হবে, সাথে সাথে 'ভজন' তথা হিন্দুদের ধর্মীয় সঙ্গীত শুনতে হবে। শুধু তাই নয়, মন্দিরের 'প্রসাদ'ও ভজন করতে হবে। অষ্টম শ্রেণীর বাংলা প্রথমপত্র পাঠ্যবই 'সাহিত্য কণিকা'র ১৬ পৃষ্ঠার কিছু শব্দার্থ এই; *নটমন্দির*- দেবমন্দিরের সামনের ঘর যেখানে নাচ-গান হয়। *বোষ্টম*-হরিনাম সংকীর্তন করে জীবিকা অর্জন করে এমন বৈষ্ণব। *কাপালিক*-তান্ত্রিক হিন্দু সম্প্রদায়। *চণ্ডিমণ্ডপ*-যে মণ্ডপে বা ছাদযুক্ত চত্বরে দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবীর পুজো হয়। *দণ্ডবৎ*-মাটিতে পড়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। এভাবে পাঠ্যপুস্তকে নানা কায়দায় একদিকে যেমন হিন্দুবাদ ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি ইসলামী ভাবধারার বিলুপ্তি ঘটানো হয়েছে।

ইসলামী বিষয়গুলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে বিকৃতভাবে।

উদাহরণ-১ নবম-দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য বইয়ের ২৪২ পৃষ্ঠায় আল মাহমুদের বোশেখ কবিতার 'রাজা সোলেমান' শব্দের টীকায় লেখা হয়েছে– 'ডেভিডের পুত্র এবং ইসরাইলের তৃতীয় রাজা। তিনি বীর ও দক্ষ যোদ্ধা ছিলেন।' এখানে বাইবেলে ব্যবহৃত ডেভিড-এর পরিবর্তে কুরআনে বর্ণিত ও সুপরিচিত শব্দ 'দাউদ' এবং বীর ও দক্ষ যোদ্ধা-র পাশাপাশি 'নবী' ছিলেন লেখা হলে ৯০ ভাগ শিক্ষার্থী 'রাজা সোলেমান'কে সহজেই চিনতে পারতো। এতে করে পাঠ্যপুস্তকে শব্দার্থ ও টীকা সংযোজনের উদ্দেশ্যটিও সফল হতো দারুণভাবে। কিন্তু পুস্তক প্রণেতাদের ধর্মনিরপেক্ষতা তথা সীমাহীন ইসলাম বিদ্বেষ তা করতে দেয়নি।

উদাহরণ–২ অষ্টম শ্রেণীর আনন্দপাঠ বইয়ের ৩৬ পৃষ্ঠায় সোহরাব রোস্তম গল্পের সার-সংক্ষেপে লেখা হয়েছে– 'কথিত আছে, গজনির সম্রাট সুলতান মাহমুদ কবি ফেরদৌসীকে 'শাহনামা' কাব্য রচনার অনুরোধ করেছিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কবির রচিত প্রতিটি শ্লোকের জন্য একটি করে সোনার মোহর দেবেন। সুলতান শেষ পর্যন্ত এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেননি। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করায় কবি খুব দুঃখ পান। সুলতান অবশ্য পরে তার এ ভুল বুঝতে পেরে কবির কাছে ষাট

হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু কবি আর তখন জীবিত ছিলেন না।'

বলাবাহুল্য এটা মুসলিম শাসকদের সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনকে বিষিয়ে তোলার এক অভিনব পদ্ধতি। সতেরো বার ভারত আক্রমণ করে তৎকালীন হিন্দু জালিম শাসকদের ঘুম হারাম করে দেওয়ার অপরাধেই কি তবে মহান সুলতান মাহমুদের চরিত্রে কল্পিত প্রতিজ্ঞাভঙ্গের কালিমা লেপন? তাও আবার 'কথিত আছে'-এর বরাত দিয়ে! ব্যাপারটি ভারতীয় পাঠ্যপুস্তকে লেখা হলে না হয় মেনে নেয়া যেতো। কেননা মুসলিম শাসকদের চরিত্রহনন তো বেশিরভাগ হিন্দু ইতিহাসবিদের সাধারণ অভ্যাস এবং সস্তা প্রসিদ্ধির হাতিয়ার। শ্রী রতন লাহিড়ী ঠিকই বলেছেন– আজ স্কুল কলেজে যে ইতিহাস পড়ানো হয় সে সব ঐ সাম্রাজ্যবাদীদের প্রাচীন গলিত ও বিকৃত ইতিহাসের আধুনিক সংস্করণ মাত্র। (ভারত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের ইতিহাস: পৃষ্ঠা ৯)

উদাহরণ–৩ নবম-দশম শ্রেণীর মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য বইয়ের ১৩৪ পৃষ্ঠায় জহির রায়হান লিখিত বাঁধ গল্পের একটি উদ্দীপকে লেখা হয়েছে 'ভোরবেলা মনু মিয়াকে এক রকম জোর করেই মাছ ধরতে নিয়ে যায় আবুল আর কোরবান। সে বলে নামাজ না পইড়া গেলে খোদা নারাজ অইবো, তৎক্ষণাৎ পথে বিদ্যুৎ চমকালে সে বলে– দোহাই আবুল ভাই– আমারে ছাইড়া দাও, স্বয়ং খোদাই তো নিষেধ করতাছে।' তারপর প্রশ্ন করা হয়েছে– উদ্দীপকের মনু মিয়া চরিত্রে 'বাঁধ' গল্পের কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ক. ধর্ম-সচেতনতা খ. ধর্মভীরুতা গ. অলসতা ঘ. কর্মবিমুখতা

প্রিয় পাঠক! বাঁধ গল্পটি যে আঙ্গিকে লেখা তাতে মনু মিয়ার কর্মপন্থাকে একজন শিক্ষার্থী স্বাভাবিকভাবেই কর্মবিমুখতা হিসেবে চিহ্নিত করবে। অথচ 'নামাজ না পইড়া গেলে খোদা নারাজ অইবো' কথাটিতে স্পষ্টই বোঝা যায়, মনু মিয়া মাছ ধরতে যেতে অস্বীকার করেনি, যাওয়ার আগে কেবল নামাজ পড়ে নিতে চেয়েছে। কাজে যোগদানের আগে কিংবা কাজের মাঝখানে নামাজের সময় হলে কাজ ফেলে রেখে আগে নামায পড়ে নেয়া, নিঃসন্দেহে একজন মুসলমানের ধর্মভীরুতা এবং ধর্মসচেতনতার আলামত। আর নামাজ না পড়ে কাজে গেলে খোদা যে নারাজ হবেন এটা মুসলমানের জরুরী আকীদার অন্তর্ভুক্ত। অথচ এটাকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যেন নামাজ পড়া হল কর্মবিমুখতা। এতে করে একজন শিক্ষার্থী অবশ্যই ধর্ম পালনে অবহেলা করতে উৎসাহিত হবে এবং পরিণামে 'ধর্মহীন কর্মবীর' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে।

২৩ মে ২০১৬ ইং দৈনিক নয়া দিগন্তে প্রকাশিত 'পাঠ্য বইয়েও আগ্রাসন: সচেতনতা প্রয়োজন' নিবন্ধে জনাব এম জি হোসেন নতুন পাঠ্যপুস্তকের পোস্টমর্টেম করেছেন চমৎকারভাবে। তিনি লিখেছেন–

'...বইগুলোর কাগজ, ছাপা, চিত্র ও বাঁধাই সব কিছু উনবিংশ শতাব্দীর প্রতিনিধিত্ব করছে বলেই মনে হয়। এটি শিশুদের মন ও চেতনাকে যে আহত ও সঙ্কীর্ণ করছে তাও বোঝতে আমরা যেন অক্ষম। 'ভিক্ষার চাল কাঁড়া না আকাঁড়া' এমন মানসিকতা অন্তত এ বেলা পরিহার জরুরি। দেশের দেড় কোটি ছাত্রছাত্রীর জন্য ভালো মানের বই সরবরাহ করতে মাথাপিছু ৫০০ টাকা খরচ হলেও শুধু হলমার্কের লুটে নেয়ার সমপরিমাণ অর্থে ছয় বছর বিনামূল্যে বই বিতরণ সম্ভব। তাহলে শিশুদের জন্য কৃপণতা বা কৃচ্ছতার অবকাশ কোথায়?

বোর্ডের বইগুলোতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির প্রয়াস সুস্পষ্ট। কিন্তু '৪৭ এর ব্যাপারে ধারণাটি একেবারেই অস্পষ্ট। '৪৭ না হলে যে এ অঞ্চলটি কাশ্মিরের বা মিজোরামের (কিংবা হায়দ্রারাবাদের) মতো কিছু একটা হতো। এ ধারণাটি জাতীয় প্রয়োজনেই স্পষ্ট হওয়ার কথা হলেও তা হয়নি।

প্রথম শ্রেণীর বাংলা বইটিতে (আমার বই) শব্দ গঠন প্রক্রিয়ায় 'ঋ'তে 'ঋষি' এবং 'র'তে 'রথ' শেখানো হয়েছে। এতে আমাদের আপত্তি না-ই বা থাকল, কিন্তু একই চেতনার ধারাবাহিকতায় 'ম'তে 'মসজিদ' না হলেও 'মন্দির' তো হতে পারতো? কিন্তু তাও না, শিখিয়ে দেয়া হলো 'ম'তে 'মগডাল'। অসাম্প্রদায়িকতা প্রমাণে এমনটি কী খুব জরুরি ছিল?

একই বইয়ের ৪৬ পৃষ্ঠায় দাদীকে 'দাদীমা' শেখানোর অদ্ভুত প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল। দাদীকে 'মা' বলা গেলে একই ক্যাডার ও লিঙ্গভুক্ত বলে শালীমা, ভাবীমা ডাকায় বোর্ড কর্তৃপক্ষের বোধকরি আপত্তি থাকার কথা নয়। একই রকম অপপ্রয়াস লক্ষ্য করা যায় দ্বিতীয় শ্রেণীর বইটিতেও। (পৃষ্ঠা-৩৭)। তৃতীয় শ্রেণীতে 'কুঁজু বুড়ির গল্প' নামের লেখাটি আদৌ কোনো গল্প হলো? এ ধরনের লেখার বিনিময়ে বোর্ড কর্তৃপক্ষকে 'উপযুক্ত' সম্মানীও হয়তো গুণতে হয়েছে। তা না হয় হলো, কিন্তু গুণীজনেরা তা সম্পাদনা ও সঙ্কলন করলেন কেমন করে?

পঞ্চম শ্রেণীর বাংলা বইয়ে 'এই দেশ এই মানুষ' রচনাটিতে মঙ্গলের প্রতীক ও লক্ষ্মীর বাহন পেঁচার মুখোশ দেয়া হয়েছে অর্ধপৃষ্ঠা জুড়ে বৈশাখী উৎসবের প্রধান আকর্ষণ হিসেবে। শখের মৃৎ শিল্প রচনাটির অনুশীলনীতে হিন্দু, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের চারটি পুরাকীর্তির ছবি দেয়া হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৫২ সালে নির্মিত 'কান্তজির মন্দির' স্থান পেলেও কোনো মসজিদ বা মুসলিম স্থাপত্য স্থান পায়নি। একই বইতে কবি গোলাম মোস্তফা রচিত 'মুনাজাত' কবিতাটি 'প্রার্থনা' নামে সঙ্কলিত হলেও 'এটি কুরআন শরীফের সূরা ফাতেহার ভাবানুবাদ' শিক্ষার্থীদেরকে এই ধারণাটি দিতেও কার্পণ্য করা হয়েছে। অতীতেও এই কবিতাটি বিভিন্ন ক্লাসে পাঠ্য ছিল। কিন্তু এবারই প্রথম ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেল। যদিও শিক্ষার্থীর জ্ঞানের প্রসারতার জন্য বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি। বুঝতে কষ্ট হয়, শিক্ষার্থীদের কাছে এটা গোপন করা না হলে ধর্ম নিরপেক্ষতার এমন কী ক্ষতি হতো?

একই বইতে হুমায়ুন আজাদের 'বই' কবিতাটি সঙ্কলিত হয়েছে। সব ধর্মগ্রন্থের মূল বক্তব্য পাপের জন্য পরকালে শাস্তি এবং পুণ্যের জন্য পুরস্কার। এ কবিতায় কবি প্রচ্ছন্নভাবে ধর্মীয় গ্রন্থ বিশেষ করে কুরআন শরীফ না পড়ার জন্য শিক্ষার্থীদের তাগিদ দিচ্ছেন। এ কারণে যে ওটি তাকে ভয় দেখায়। এখন যদি কোনো শিক্ষার্থী 'যে বই তোমায় ভয় দেখায়' বলতে কোন বইটি, তা নির্দিষ্ট করে জানতে চায় বোর্ড কর্তৃপক্ষের অকপট জবাবটা কী হবে? সুতরাং এই কবিতাটি যে আমাদের সাংবিধানিক চেতনার সাথেও সাংঘর্ষিক তা অস্বীকার করবে কে? তারপরও এমন একটি বিদ্বেষপূর্ণ কবিতা পাঠ্য হলো কিভাবে?

'সাহিত্য কণিকা' অষ্টম শ্রেণীর বাংলা বই। এতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রসিদ্ধ 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি সঙ্কলিত হয়েছে। ...কবিতাটির যাদুকরী ছন্দ আজও আমাকে বিমুগ্ধ করে। তাই আগ্রহভরে পাতাটা খুলতেই যে চিত্রটি

নজরে পড়ল তা সত্যি অবাক হওয়ার মতো। অত্যাচারী ভূমিদস্যু বা জমিদার হিসেবে (কবিতার ভাষায় রাজা) লম্বা দাড়ি ও পাঞ্জাবি পরা একব্যক্তিকে উপস্থাপন করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম দর্শনেই জমিদারকে মুসলমান না ভাবার কোনো সঙ্গত কারণ নেই। অথচ কবিতাটির কোথাও জমিদারের নামের উল্লেখ না থাকলেও 'বাবু' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বারকয়েক। আর 'বাবু' শব্দটি সবসময় হিন্দু ভদ্রলোকের বেলায়ই ব্যবহার হয়ে আসছে। তা ছাড়া কবির কোনো রচনাতে কদাচ কোনো মুসলিম চরিত্র এসে থাকলেও তা চাষী, চাকর-বাকর, পিয়ন-চাপরাশির পদমর্যাদার ওপরে ওঠতে পারেনি, জমিদার বা রাজা তো দূরের কথা। রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্পর্কে যাদের এতটুকু ধারণা নেই তারা হেন কর্মে হাত দেন কেমন করে? তবে কি অসাম্প্রদায়িকতার আধুনিক ধারণা (মুসলিম বিদ্বেষ) অনুসারেই এমনটি করা হলো? একই বইতে কবি জীবনানন্দ দাস রচিত 'আবার আসিব ফিরে' কবিতাটিও সঙ্কলিত হয়েছে। কবির দেশপ্রেমের সাথে ধর্মানুভূতি বা বিশ্বাসের সমন্বয় ঘটেছে এ কবিতায় বেশ সুন্দরভাবেই। আমাদের এতে আপত্তি নেই বটে তবে পরামর্শ হলো শিক্ষার্থীদের কাছে অকপটভাবে এটিও তুলে ধরা জরুরি যে, হিন্দু ধর্মের অন্যতম মৌলিক বিশ্বাস 'জন্মান্তরবাদ'কে কবি এখানে কবিতার মূল উপজীব্য বা চেতনা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। (যা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থীও বটে) এতে করে শিশুদের জ্ঞানের সীমা হবে প্রশস্ততরও।

'মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য' নবম-দশম শ্রেণীর বাংলা বই। শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর। বোধকরি এই দিকটির প্রতি গুরুত্ব দিয়েই দেশপ্রেম ও জাতি গঠনমূলক কবিতা ও প্রবন্ধগুলোকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। কবি শামসুর রাহমানের 'তোমাকে পাওয়ার জন্য হে স্বাধীনতা' নির্মলেন্দু গুণ এর 'স্বাধীনতা, এ শব্দটি কিভাবে আমাদের হলো', সৈয়দ শামসুল হকের 'আমার পরিচয়' ছাড়াও এমনতরো আরো কিছু গদ্য ও পদ্য সঙ্কলিত হয়েছে বইটিতে। কিন্তু অবাক হওয়ার বিষয় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ঠিক বিপরীত চেতনা সমৃদ্ধ 'সাঁকোটা দুলছে' শিরোনামের কবিতাটি স্বাধীন বাংলাদেশের পাঠ্যবইতে স্থান পেল কেমন করে, যে কবিতাটিতে আমাদের স্বাধীন সত্তাকেই অস্বীকার করা হয়েছে? আবার এই চেতনাটি উপলব্ধি করেই যে সঙ্কলনে স্থান দেয়া হয়েছে তা প্রকারান্তে স্বীকার করেও নেয়া হয়েছে। প্রমাণস্বরূপ অনুশীলনী থেকে দু'টি উদ্দীপক এখানে তুলে ধরছি।

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নের উত্তর দাও :

শিহাব উদ্দীন মিডল স্কুলে পড়তো। বাহাদুরপুর, মেঘনা, বাগমারা ও সেনগ্রাম পাশাপাশি গ্রাম ছিল। গ্রামের হিন্দু-মুসলমান শিক্ষার্থী হাসি-আনন্দে স্কুলে যেত। ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হলে শিহাব দেখতে পেল তার হিন্দু সহপাঠীরা সপরিবারে ভারত চলে যাচ্ছে। দেবব্রতের সাথে বন্ধুত্বের স্মৃতি শিহাব ভুলতে পারে না। স্কুলের সামনের বরই গাছ থেকে বরই পাড়ার স্মৃতি ৭০ বছর বয়সেও শিহাব বিস্মৃত হয়নি।'

এরপর প্রশ্ন করা হয়েছে :

উদ্দীপকে 'সাঁকোটা দুলছে' কবিতার কোন দিক ফুটিয়ে তুলছে?

ক. পড়শি নদীটি ধনুকের মতো বাঁকা

খ. সাঁকোটি এখনো আছে

গ. বন্ধু হারালে দুনিয়াটা খাঁ খাঁ করে

ঘ. এপার ওপার স্মৃতিময় একাকার।

'সৃজনশীল প্রশ্ন'-

ঋত্বিক কুমার ঘটক বিখ্যাত চলচ্চিত্রকার (ভারতের) তার অধিকাংশ চলচ্চিত্রে দেশ ভাগের মন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে। নিজের জন্মস্থানে যেতে হলে পাসপোর্ট ও ভিসা লাগবে। এই বেদনা তার মতো অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। এ কারণেই তিনি বলতেন, 'বাংলার ভাগ করিবার পারিছ, কিন্তু দিলটারে ভাগ করবার পারো নাই।'

এবার সৃজনশীল প্রশ্ন :

ক) বন্ধুরা কিভাবে একে অন্যকে ডাকাডাকি করতো? (কবিতা থেকে)

খ) বন্ধুদের মধ্যে কথায় কথায় ভাব ও আড়ি হতো কেন? (ওই)

গ) উদ্দীপকটি 'সাঁকোটি দুলছে' কবিতার কোন দিকটি তুলে ধরেছে?

ঘ) উদ্দীপকটি 'সাঁকোটি দুলছে' কবিতার মূলভাবের প্রতিনিধিত্ব করছে– মূল্যায়ন কর।

অর্থাৎ ক খ ও গ প্রশ্নে শিক্ষার্থীর মগজ ধোলাই, এর পর 'ঘ' প্রশ্নটিতে 'বাংলাদেশের জন্মটাই ভুল' কৌশলে এমন একটি জবাবই শিক্ষার্থীর মগজ থেকে বের করার চেষ্টা করা হয়েছে, আর এমনটি ছাড়া শিক্ষার্থীর জন্য বিকল্পও নেই।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদির ঢাকা সফরে এক সেমিনারে 'অতীতের বড় বড় ভুলগুলো শোধরাবার সময় হয়েছে' বলে যে মন্তব্য করে গেছেন, তার আবেগঘন উচ্চারণে আলোচ্য 'সাঁকো' কবিতারই প্রতিধ্বনি শোনা গেল কী? কিন্তু প্রশ্ন হলো– মোদি জানলেন কেমন করে? এতকাল ভারত বিভক্তির জন্য জিন্নাহ, মুসলমানদের দায়ী করা হলেও এখন বলা হচ্ছে 'মুসলমানরা বিভক্তি চায়নি, কংগ্রেসের ভুলই ভারত বিভাগের জন্য দায়ী।' বেশ ভালো কথা– ভুল যাদের শোধরাবার দায়টাও তো তাদেরই। তাদের ভুলের খেসারত দিতে গিয়ে আমরা আর একটা কাশ্মির-মিজোরাম (বা হায়দ্রারাবাদ) হতে দিতে পারি কোন দুঃখে? তারপরও বন্ধুদের কাছে প্রশ্ন– 'ভুল' শোধরানের পর দিল্লি ঢাকার অধীন হবে, নাকি ঢাকা কলকাতার মতোই দিল্লির অধীন হবে?...

গরুর গোশত খাওয়ার জন্য আর কখনো পুড়িয়ে মারা হবে না তো আমাকে? তোমাদের সেই 'রামরাজ্যে' আমাদেরকে অন্তত বানর হনুমানেরতুল্য মর্যাদা দেয়া হবে কী? 'সোনার বাংলা' কাশ্মিরের মতো পূর্ব-ভারতের আর একটি বধ্যভূমি হবে না তো? ...।

বাংলাদেশ নয় যেন পশ্চিমবঙ্গের পাঠ্যপুস্তক

আলোচ্য 'মাধ্যমিক বাংলা সাহিত্য' বইটিতে অনেকটা পশ্চিমবঙ্গের আদলেই নির্বাচিত কবিতাগুলোর প্রথম থেকে ক্রমিক নং ১১ পর্যন্ত এবং গদ্যের তালিকায় ৮ নম্বর পর্যন্ত একজন মুসলমান লেখকও নেই। তাদের সাহিত্যকর্ম জ্ঞান-পাণ্ডিত্য সম্পর্কে আমাদের কোন প্রশ্ন বা সংশয় নেই। কিন্তু আমাদের সংশয় হলো এই তালিকা অতি সন্তর্পনে ও কৌশলে শিক্ষার্থীদের মনোরাজ্যে হীনম্মন্যতার বীজ ঢুকিয়ে দিচ্ছে যে, বাংলা সাহিত্যে মুসলমানদের তেমন অবদানই নেই। শুধু নবম-দশম শ্রেণীর কেন প্রতিটি ক্লাসের বাংলা বইয়ের সেই এক ও অভিন্ন চিত্র। হ্যাঁ, ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা গেল ষষ্ঠ শ্রেণীর বইতে। প্রথম লেখাটি এম ওয়াজেদ আলির লেখা (ভারতের) 'রাঁচি ভ্রমণ'। কিন্তু লেখাটি রাঁচির ভ্রমণের স্থলে করাচি নয়, যদি মক্কা বা আঙ্কারা ভ্রমণও হতো তাহলে ওয়াজেদ আলির লেখাটি আদৌ নির্বাচিত হতো কি?

বাদ দেয়া হয়েছে মুসলিম শিল্পকলা

বোর্ডের বইগুলোর মলাটে অঙ্কিত নকশা ও আল্পনাগুলোতে হিন্দু সম্প্রদায়ের শিল্পকলার প্রতিফলন থাকলেও

(১৮ পৃষ্ঠায় দেখুন)

কথিত এক খতীব সম্পর্কে

গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন ও তার উত্তর

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

বরাবর,
হযরত মুফতী সাহেব দা.বা.

১. আমাদের মসজিদের খতীব সাহেব কোন মাযহাব অনুসরণ করেন না। তিনি একজন লা-মাযহাবী লোক। বিভিন্ন সময়ে তিনি বিশ্ববরেণ্য উলামায়ে কেরামকে নিয়ে বাজে মন্তব্য করেন। এমনকি চার মাযহাবের শ্রেষ্ঠ ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর ভুল ধরার মত সাহস দেখিয়েছেন। তিনি ইমাম আবূ হানীফা রহ. এর সরাসরি সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেন, ইমাম আবূ হানীফা রহ. একজন সাধারণ ব্যবসায়ী ছিলেন এবং দীর্ঘ দিন ফারসী ভাষায় নামায আদায় করেছেন।

২. কোন লা-মাযহাবী ইমামের পিছনে মাযহাব অনুসারী মুসল্লীগণের নামায হবে কিনা?

৩. চার মাযহাবের সংমিশ্রণ করা জায়েয কিনা?

৪. তিনি সফরে গেলে যোহর ও আসর নামায এবং মাগরিব ও ইশার নামায একসাথে পড়েন এবং অন্যদেরকেও একসাথে পড়ার পরামর্শ দেন। এভাবে নামায আদায় করা জায়েয হবে কি?

৫. বিতর নামায কত রাকাআত? খতীব সাহেব নিজে বিতর নামায এক রাকাআত আদায় করেন এবং মুসল্লীদেরকেও এক রাকাআত নামায আদায় করার পরামর্শ দেন। মসজিদে এক রাকাআত বিতর নামায প্রচলন করার চেষ্টা চালাচ্ছেন।

৬. বর্তমান খতীব মসজিদে হালাল টাকা দান করার কথা বলেন। আবার তিনি নিজেই চলচিত্র অভিনেতার নিকট থেকে টাকা নিয়ে মসজিদের জন্য জায়নামায ক্রয় করেন। এটা জায়েয হবে কি?

৭. মহিলাদের মসজিদে এসে রমাযান মাসের ই'তিকাফ (শেষ দশদিন) করা জায়েয আছে কি?

৮. জুমু'আ, তারাবীহ এবং ঈদের নামায মহিলাদের মসজিদে এসে জামাআতের সহিত আদায় করা জায়েয আছে কি?

অনুগ্রহপূর্বক উপরোক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তর কুরআন এবং হাদীসের আলোকে প্রদান করে বাধিত করবেন।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

চতুর্থ প্রশ্নের উত্তর

আল্লাহ তা'আলা পাঁচ ওয়াক্ত নামায তার স্ব স্ব ওয়াক্তে পড়াকে ফরয করেছেন। নিম্নল্লিখিত আয়াতসমূহ দেখুন,

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

অর্থ : তোমরা সংরক্ষণ কর সমস্ত নামাযের এবং মধ্যবর্তী নামাযের। (সূরা বাকারা- ২৩৮)

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا

অর্থ : নিশ্চয় নামায মুসলমানদের উপর নির্দিষ্ট সময়ের শর্তে ফরয করা হয়েছে। (সূরা নিসা- ১০৩)

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ

অর্থ : আর নামাযের পাবন্দী করুন দিবসের দুই প্রান্তে ও রজনীর কিছু অংশে। (সূরা হূদ- ১১৪)

এ আয়াতে ফজর, আছর ও মাগরিবের কথা বলা হয়েছে।

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ

অর্থ : সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাত অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া পর্যন্ত নামাযসমূহ আদায় করতে থাকুন। (সূরা বনী ইসরাইল- ৭৮)

এ আয়াতে বিশেষ করে যোহর ও ইশার কথা বলা হয়েছে।

মি'রাজের পর হযরত জিবরাঈল আমীন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দু'দিনে দশবার ইমামতি করে নামাযের ওয়াক্ত শিখিয়েছেন। এ সকল আয়াত ও হাদীস নামাযের ওয়াক্ত বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অকাট্য। সুতরাং কোন হাদীসের বাহ্যিক মর্ম যদি অকাট্য আয়াত ও হাদীসের সাথে সাংঘর্ষিক হয়, তাহলে তার এমন ব্যাখ্যা করতে হবে যেন আয়াত ও হাদীসের অকাট্য অর্থের সাথে সংঘর্ষ দূর হয়ে যায়। আর তা সম্ভব না হলে আয়াত ও হাদীসের অকাট্য মর্মকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। শরয়ী বিধানের এটা সর্বসম্মত মূলনীতি। এ মূলনীতির আলোকে যে সকল হাদীসে দুই নামায এক ওয়াক্তে পড়ার বর্ণনা পাওয়া গেছে ফুকাহায়ে কেরাম সেগুলোর বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে যে, দুই ওয়াক্তের নামাযকে একসাথে পড়ার দুইটি পদ্ধতি রয়েছে।

এক. বাস্তবেই একসাথে করা অর্থাৎ দুই ওয়াক্তের নামায এক ওয়াক্তের মধ্যে জমা করা। যেমন, যোহর ও আছরকে একসাথে করে যোহরের ওয়াক্তে পড়া। তেমনিভাবে মাগরিব ও ইশাকে একত্র করে ইশার ওয়াক্তে পড়া। শুধু হজ্জের সময় আরাফায় ও মুযদালিফায় হাজীদের জন্য বিশেষ এ পদ্ধতি প্রযোজ্য, অন্য ক্ষেত্রে নয়।

দুই. দেখতে একসাথে, আসলে একসাথে নয়। অর্থাৎ প্রত্যেকটাকেই নিজ নিজ ওয়াক্তে রেখে প্রথমটা শেষ ওয়াক্তে আর দ্বিতীয়টাকে শুরু ওয়াক্তে এনে একসাথে করে পড়া। যেমন, যোহরকে তার শেষ ওয়াক্তে আর আছরকে শুরু ওয়াক্তে পড়া। তেমনিভাবে ইশা ও মাগরিবের ক্ষেত্রে। সফরের ক্ষেত্রে বা অন্য কোন প্রয়োজনে এ পদ্ধতি অবলম্বন করা জায়েয আছে। হজ্জের সময় ব্যতীত যেসব হাদীসে দুই নামায একসাথে পড়ার কথা এসেছে সবগুলোর উদ্দেশ্য এ দ্বিতীয় পদ্ধতি। অন্যথায় নিম্নোক্ত সহীহ হাদীসটির কী ব্যাখ্যা হবে একটু চিন্তা করে দেখুন;

عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في المدينة، من غير خوف ولا مطر

অর্থ : হযরত ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় যোহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশাকে একসাথে পড়েন কোন ধরনের ভয়-ভীতি ও বৃষ্টি বাদল ছাড়াই। অন্য বর্ণনায় আছে "ولا سفر" অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফরেও ছিলেন না। (মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ৩৩২৩, ৩২৩৫)

এ হাদীসের বাহ্যিক অর্থ দাঁড়ায়, কোন সমস্যা ছাড়াই যোহর-আসর একসাথে যে রকান এক ওয়াক্তে এবং মাগরিব-ইশা একসাথে যে কোন এক ওয়াক্তে পড়েছেন; অথচ এটা অসম্ভব। কাজেই বাধ্য হয়ে এখানে পূর্বোক্ত দ্বিতীয় পদ্ধতিতে একসাথে পড়া বুঝতে হবে।

এছাড়া নিম্নে এ মর্মে দু'জন বিজ্ঞ সাহাবীর মত উল্লেখ করা হল,

عبد الله بن مسعود والذي لا إله غيره ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا في وقتها إلا صلاتين جمع بين الظهر والعصر يوم عرفة وبين المغرب والعشاء بجمع

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ রাযি. বলেন, ঐ সত্তার শপথ যিনি ছাড়া

আর কোন মা'বুদ নেই! রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো এক ওয়াক্তের নামায অন্য ওয়াক্তে পড়তেন না। তবে আরাফার দিন যোহর-আছর একত্রে এবং মাগরিব-ইশা মুযদালিফায় একত্রে পড়তেন। (আলইসতিযকার ২/২০৭)

১. حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَصْرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ.

অর্থ : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি বিনা ওযরে দুই ওয়াক্তের নামায একত্র করে এক ওয়াক্তে পড়ল সে যেন কবীরা গুনাহসমূহের একটা দরজা খুলল। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ১৮৮)

পঞ্চম প্রশ্নের উত্তর

বিতর নামায তিন রাকাআত। এ ব্যাপারে চার মাযহাবের ইমামগণ একমত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবসময় তিন রাকাআত বিতর পড়তেন; অসংখ্য সহীহ হাদীস দ্বারা এটি প্রমাণিত। এমনিভাবে বহু সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণের আমলেও বিতর নামায তিন রাকা'আত প্রমাণিত হয়। নিম্নে এ বিষয়ে কিছু সহীহ হাদীস উল্লেখ করা হল,

আবূ সালামা রহ. বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাযি.কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম,

كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا، فَلَا تَسَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا.

অর্থ : রমাযানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায কেমন ছিল? হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানে ও রমযানের বাইরে এগারো রাকাআতের বেশি পড়তেন না। প্রথমে চার রাকাআত পড়তেন এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। এরপর আরও চার রাকাআত পড়তেন, এর সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্পর্কে জিজ্ঞোস করো না। এরপর তিন রাকাআত বিতর পড়তেন। (সহীহ বুখারী; হা.নং ১১৪৭, সহীহ মুসলিম; হা.নং ৭৩৮)

এ হাদীসের বিশ্লেষণে মালেকী মাযহাবের অনুসারী হাফিযুল হাদীস ইমাম ইবনে আব্দুল বার রহ. বলেন, তিনি চার রাকাআত পড়ে ঘুমাতেন। তারপর আবার চার রাকাআত পড়ে ঘুমাতেন। অতঃপর উঠে তিন রাকাআত বিতর পড়তেন। (আল ইসতিযকার ২/১০০)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি. বলেন,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، كَانَ يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ،.. وَيَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوعِ، وفى رواية ولا يسلم الا فى اخرهن–

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাআত বিতর পড়তেন। প্রথম রাকাআতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা কাফিরূন, তৃতীয় রাকাআতে সূরা ইখলাস পড়তেন এবং রুকূর পূর্বে দু'আয়ে কুনূত পড়তেন। একই হাদীসের অপর বর্ণনায় আছে- আর কেবল শেষ রাকাআতেই সালাম ফিরাতেন। (সুনানে নাসায়ী হা.নং ১৬৯৯, মুশকিলুল আসার ১১/৩৬৮)

আল্লামা আইনী, ইবনুল কাত্তান, শাইখ শুআইব আরনাউত প্রমুখ মুহাদ্দিস হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন। আলবানী রহ.ও ইরওয়াউল গালীল (২/১৬৭) কিতাবে হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে আবী কাইস রহ. বলেন, আমি হযরত আয়েশা রাযি.কে জিজ্ঞেস করলাম,

بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ قالت: «كان يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع، ولا بأكثر من ثلاث عشرة»

অর্থ : নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত রাকাআত বিতর পড়তেন? তিনি উত্তরে বলেন, চার ও তিন, ছয় ও তিন, আট ও তিন, দশ ও তিন। তিনি বিতর সাত রাকাআতের কম এবং তেরো রাকাআতের অধিক পড়তেন না। (সুনানে আবূ দাউদ হা.নং ১৩৬২, শরহু মাআনিল আসার ১/২০১, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৫১৫৯)

আল্লামা আইনী ও শুআইব আরনাউত এটিকে সহীহ বলেছেন।

ইমাম বুখারীর উস্তাদ ইসহাক ইবনে রাহুয়াহ বলেন, এ ধরনের হাদীসসমূহে বিতরসহ রাতের পুরো নামাযকেই বিতর শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। (সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৪৫৭ [হাদীস পরবর্তী বক্তব্য দ্রষ্টব্য])

হাফেয ইবনে হাজার রহ. উল্লিখিত হাদীস সম্পর্কে বলেন, আমার জানামতে এটি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সর্বাধিক সহীহ হাদীস। এ বিষয়ে হযরত আয়েশা রাযি.-এর বর্ণিত হাদীসের বর্ণনাকারীদের মাঝে যে ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় এর দ্বারা সেসবের মাঝে সমন্বয় করা যায়। (ফতহুল বারী ৩/২৫)

আর এ হাদীসে সর্বাবস্থায় তিন রাকাআত পৃথকভাবে পড়ার কথা উল্লেখ হয়েছে। সুতরাং স্পষ্টই বোঝা যায়, এটিই প্রকৃত বিতর।

সাঈদ ইবনে যুবাইর রাযি. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন,

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث، يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل ياأيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد.

অর্থ : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিন রাকাআত বিতর পড়তেন। প্রথম রাকাআতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাকাআতে সূরা কাফিরূন, তৃতীয় রাকাআতে সূরা ইখলাস পড়তেন। (সুনানে নাসায়ী; হা.নং ১৭০৭, সুনানে তিরমিযী; হা.নং ৪৬২, সুনানে দারেমী; হা.নং ১৫৮৯, মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৬৯৫১, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৭৭৬)

শুআইব আরনাউত বলেন, হাদীসটি সহীহ, ইমাম নববী রহ. বলেছেন, হাদীসটি সহীহ।

হযরত শা'বী রহ. বলেন, আমি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. ও আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাযি.কে জিজ্ঞেস করেছি যে, রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায কত রাকাআত ছিল?

فقالا: ثلاث عشرة ركعة، منها ثمان ويوتر بثلاث، وركعتين بعد الفجر.

অর্থ : তারা উভয়ে বলেন, তিনি রাতে মোট তেরো রাকাআত পড়তেন। প্রথমে আট রাকাআত, অতঃপর তিন রাকাআত বিতর পড়তেন। আর ফজরের ওয়াক্ত হয়ে গেলে দুই রাকাআত (ফজরের সুন্নাত) আদায় করতেন। (সুনানে নাসায়ী কুবরা; হা.নং ৪০৮, ১৩৫৭, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ১৩৬১, ত্বহাবী ১/১৯৭ [আল্লামা আইনী রহ.

বলেন, এর সনদ সহীহ], নুখাবুল আফকার ৩/২১১)

আলী ইবনে আব্দুল্লাহ তার পিতা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণনা করেন,

أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب [آل عمران: ١٩٠] فقرأ هؤلاء الآيات حتى ختم السورة، ثم قام فصلى ركعتين، فأطال فيهما القيام والركوع والسجود، ثم انصرف فنام حتى نفخ، ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات، كل ذلك يستاك ويتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات، ثم أوتر بثلاث،

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লম্বা কিয়াম ও রুকূর মাধ্যমে দুই দুই করে তিনবারে ছয় রাকাআত নামায আদায় করলেন। প্রতিবারই মিসওয়াক ও উযূ করেছেন এবং উল্লিখিত আয়াতসমূহ পড়েছেন। সবশেষে তিন রাকাআত বিতর পড়েছেন। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ৭৬৩, সহীহ আবূ আওয়ানা ২/৩২১)

এছাড়া অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ তিন সূরা করে তিন রাকাআত বিতর পড়তেন। এ বিষয়ে ইমাম তিরমিযী রহ. তার সুনানে তিরমিযীতে সুস্পষ্ট করে বলেন,

والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعدهم أن يقرأ: ب {سبح اسم ربك الأعلى}، و {قل يا أيها الكافرون}، و {قل هو الله أحد}، يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة.

অর্থ : সাহাবায়ে কেরাম ও তৎপরবর্তী আহলে ইলমদের অধিকাংশই (বিতরে) সূরা আ'লা, কাফিরূন, ইখলাস পড়াকেই গ্রহণ করেছেন। (তিন রাকাআতের) প্রতি রাকাআতে একটি করে সূরা পড়তেন। (সুনানে তিরমিযী বিতরে কিরাআত পাঠ অধ্যায়)

অনুরূপ ১৯ জন সাহাবী থেকে তিন রাকাআত বিতরে তিন সূরা পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে। (কাশফুস সিতর; পৃষ্ঠা ৪৭, আলহিদায়া ফী তাখরীজি আহাদীসিল বিদায়া ৪/১৪৮)

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

فانه قد ثبت أن ابى بن كعب كان يقوم بالناس عشرين ركعة فى رمضان .. ويوتر بثلاث فرأى كثير من العلماء أن ذلك سنة لانه اقامه بين المهاجرين والانصارولم ينكره منكر

অর্থ : নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত যে, হযরত উবাই ইবনে কা'ব রাযি. তার ইমামতিতে লোকদেরকে নিয়ে বিশ রাকাআত তারাবীহ অতঃপর তিন রাকাআত বিতর পড়তেন। (আলফাতওয়া আলকুবরা ২/২৪৫)

কাজেই বহু সংখ্যক আলেম এটাকেই আদর্শ মনে করেন। কেননা হযরত উবাই রাযি. মুহাজির ও আনসার সাহাবীগণের উপস্থিতিতে তা কায়েম করেছেন এবং কেউ তা অস্বীকার করেননি।

হযরত উমর রাযি. বলেন,

ماأحب أنى تركت الوتر بثلاث أن لى حمر النعم

অর্থ : আমি তিন রাকাআত বিতর পড়া ছাড়তে কখনোই পছন্দ করি না, যদিও এর বিপরীতে আমাকে লাল উট উপহার দেয়া হয়। (কিতাবুল আসার জামেউল মাসানীদ ১/৪১৭, মুয়াত্তা মুহাম্মাদ; পৃষ্ঠা ১৪৯, কিতাবুল হুজ্জাহ আলা আহলিল মদীনাহ ১/১৩৫)

এছাড়াও হযরত আলী, ইবনে মাসঊদ, আনাস, উবাই ইবনে কা'ব রাযি. প্রমুখ সাহাবী থেকে তিন রাকাআত বিতর পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত ইসমাইল ইবনে আব্দুল মালেক রহ. বলেন,

عن سعيد بن جبير أنه كان يوتر بثلاث ويقنت فى الوترقبل الركوع

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর রহ. তিন রাকাআত বিতর পড়তেন এবং বিতর নামাযে রুকূর পূর্বে দু'আয়ে কুনূত পড়তেন। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৬৯০৫)

এছাড়াও হযরত আলকামা, ইবরাহীম নাখায়ী, জাবের ইবনে যায়েদ হাসান, কাতাদাহ প্রমুখ তাবেয়ী থেকেও তিন রাকাআত বিতর পড়ার কথা বর্ণিত আছে।

হযরত হাসান বছরী রহ. বলেন,

أجمع المسلمون على أن الوتر ثلاث لا يسلم الافى اخرهن

বিতর নামায এক সালামে তিন রাকাআত হওয়ার ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর ইজমা (ঐক্যমত) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা; হা.নং ৬৯০৪)

মোটকথা, বিতর নামায তিন রাকাআত এ ব্যাপারে বর্তমান যুগের কথিত লা-মাযহাবী ছাড়া পূর্বের নির্ভরযোগ্য কেউ দ্বি-মত করেননি। লা-মাযহাবীরা একদিকে হযরত আয়েশা রাযি.এর সূত্রে বর্ণিত এগারো রাকাআতের হাদীস দিয়ে তারাবীহর নামায আট রাকাআত প্রমাণ করার চেষ্টা করে। অপরদিকে একই হাদীসের শেষাংশে বিবৃত তিন রাকাআত বিতরকে এক রাকাআত বলে আজব ধরনের স্ব-বিরোধিতায় লিপ্ত হয়। অথচ বিতর এক রাকাআত গণ্য করলে তাদের তারাবীহ হয়ে যাওয়ার কথা দশ রাকাআত। বর্ণিত হাদীস ও আসারে সাহাবার আলোকে যেখানে চার মাযহাবেরই সর্বসম্মতিতে বিতর নামায তিন রাকাআত। সেখানে একটি বিচ্ছিন্ন মতকে মুসল্লীদের মাঝে প্রচলনের চেষ্টা করা নিঃসন্দেহে ফিতনা সৃষ্টি করা। কোন খতীবকে এমন ফিতনা সৃষ্টির সুযোগ দেয়া মসজিদ কর্তৃপক্ষের জন্য কখনো জায়েয হবে না।

(১৫ পৃষ্ঠার পর; জাতীয় পাঠ্যপুস্তক...)

কোনো একটি বইতেও মুসলিম স্থাপত্য ও শিল্পকলার প্রতিফলন দেখা যায় না। শিক্ষার্থীদের মুসলিম শিল্পকলা সম্পর্কে অজ্ঞ রাখার নাম কী তাহলে অসাম্প্রদায়িকতা? এতে একজন শিক্ষার্থী শুধু অজ্ঞই থেকে গেল না বরং শিল্পগুণের তুলনামূলক বিচার ক্ষমতা অর্জনেও ব্যর্থ হলো।'

তবে আশার কথা, বিষয়টি নিয়ে অভিভাবক মহল তথা দেশের ধর্মপ্রাণ জনগণ এরই মধ্যে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। বিশেষ করে ইসলামী সংগঠনগুলো পাঠ্যপুস্তক থেকে ইসলামী ভাবধারা তুলে দিয়ে হিন্দুবাদ প্রতিষ্ঠার এ চক্রান্তের বিরুদ্ধে রাজপথেও নেমে পড়েছেন। এমতাবস্থায় আশা করবো, ক্ষমতাসীন মহলের বোধোদয় ঘটুক। তা না হলে শুধু এই কারণেই দ্রুত অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠতে পারে দেশ। দায়িত্বশীলদেরকে বুঝতে হবে, ধর্মনিরপেক্ষতার নামে পাঠপুস্তকে ধর্মহীনতা ও হিন্দুবাদ চাপিয়ে দেয়া হলে জাতি তা কোনোক্রমেই মেনে নেবে না।

লেখক : ইমাম ও খতীব,
বছিলা বাইতুর রহমান বড় জামে মসজিদ,
মুহাম্মদপুর, ঢাকা

আত্মপরিচয় বিমুখ, বিনয় ও সহনশীলতার পাহাড়

হযরত পাহাড়পুরী হুযূর রহ.

মাওলানা শফীক সালমান

গত ২৫ যিলকদ ১৪৩৭ হি. মোতাবেক ২৯ আগস্ট ২০১৬ খ্রি. সোমবার দুপুর আনুমানিক ৩টায় এ নশ্বর পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে মহান আল্লাহ তা'আলার সান্নিধ্যে গমন করেছেন যুগের রাহনুমা, অতীত সাধকবর্গের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি; শাইখুল হাদীস আল্লামা আব্দুল হাই পাহাড়পুরী রহ.।

তিনি ছিলেন আমীরে শরীয়ত হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.এর চিন্তা-চেতনা, যিকর ও আধ্যাত্ম সাধনার যোগ্যতম উত্তরসূরী এবং সর্বাধিক স্নেহধন্য কনিষ্ঠ জামাতা ও অন্যতম খলীফা। রাত-দিন চব্বিশ ঘণ্টা যিকর, নামায ও আখেরাতের চিন্তায় বিভোর এক মহান সাধক। ইলমী খিদমতের প্রতিটি অঙ্গনে সমান পারদর্শিতার সাথে সর্বমহলে গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা লাভ পাহাড়পুরী রহ.এর ব্যক্তিত্বে ছিল পূর্ণ মাত্রায় সমুজ্জ্বল। যেখানেই যেতেন শত সহস্র তৃষিত চাতক ঘিরে ধরতো তাকে খোদা প্রেমে সিঞ্চিত হওয়ার প্রবল বাসনায়। এ পর্যায়ের একজন অভিভাবক হারিয়ে শোকাহত বাংলার আলেমসমাজ ও মুসলিম জনতা। এ শূন্যস্থান সহসাই যে পূরণ হবার নয়।

এ ক্ষুদ্রপরিসর নিবন্ধে বাংলার এ ক্ষণজন্মা সাধক-পুরুষের কর্মবহুল বর্ণাঢ্য ও অসামান্য জীবনের সামান্য অংশ তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

কুমিল্লা জেলার মুরাদনগর উপজেলার একটি গ্রাম পাহাড়পুর। প্রাকৃতিক কোন পাহাড়ের নাম-গন্ধ নেই এখানে। মহান সৃষ্টিকর্তা হয়তো এ কারণেই এ নামটি লোকমুখে প্রসিদ্ধ করে দিয়েছিলেন যে, ভবিষ্যতে এখানে জেগে উঠবে ইলমে ওহী ও মা'রিফাতে ইলাহীর নয়নাভিরাম সুউচ্চ হিমালয়। হয়েছেও তা-ই। যুগে যুগে আহলুল্লাহদের মুবারক সিলসিলা অব্যাহত ছিল এ গ্রামে।

ইবাদত-বন্দেগী, যিকর, তিলাওয়াত ও খোদাভীতিতে উর্বর ছিল এই পূণ্যভূমি। একপর্যায়ে আবির্ভাব ঘটল মাওলানা আলতাফ হুসাইন পাহাড়পুরী রহ.এর ন্যায় ইলমের পাহাড়ের। যিনি পাহাড়পুর মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। মানিকগঞ্জ গোবিন্দল মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতাও তিনি। পাশাপাশি জেগে উঠল ইলমে ওহীর আরেক সাধক মাওলানা আব্দুস সুবহান রহ.। যিনি আব্দুল হাই পাহাড়পুরী রহ.এর খাস উস্তাদ। আজ থেকে শতবর্ষ পূর্বে ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে পাহাড়পুরের ঐতিহ্যবাহী দীনদার খানদানে জালালী বুযুর্গ মুন্সী আব্দুল জলীল রহ.এর ঔরসে উদিত হয় হযরত মাদানী রহ.এর প্রিয় শাগরিদ, হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী রহ.এর সংস্পর্শ-ধন্য হযরত মাওলানা আখতারুয্যামান পাহাড়পুরী। যিনি ছিলেন পাহাড়পুর মাদরাসার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। আর এই মহান বুযুর্গের ঘরেই জন্মগ্রহণ করেন হযরত মাওলানা আব্দুল হাই পাহাড়পুরী রহ.।

দিনটি ছিল ২৬ শ্রাবণ ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ১০ আগস্ট ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দ, রোজ বুধবার, রাতের শেষ যাম। তিন ভাই, পাঁচ বোনের মাঝে তিনি সর্বজ্যেষ্ঠ। আদর্শ পিতার ভীষণ দারিদ্র্যের ছায়াতলে এ মহামনীষীর জীবন শুরু হয় এবং আমৃত্যু অতি সতর্কভাবে তিনি আগলে রাখেন মুমিনের ভূষণ গৌরবময় দারিদ্র্যকে। হুযূরের মুহতারামা আম্মা ছিলেন তার জীবনের প্রথম পাঠশালা। আম্মার কাছে কায়েদায়ে বোগদাদীর সবক নেন। নানাজান মাওলানা আযীমুদ্দীন সাহেব ছিলেন কুমিল্লার ধামতি আলিয়া মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপ্যাল ও ফুরফুরার পীর মাওলানা আবূ বকর সিদ্দীকী রহ.এর বিশিষ্ট খলীফা। চার বছর বয়সে নানাজান তাকে নিজের কাছে নিয়ে যান এবং সাত বছর বয়স পর্যন্ত তার কাছে থেকেই মকতব, নাযেরা শেষ করেন। এরপর পাহাড়পুর এসে কিতাব বিভাগে ভর্তি হন। জালালাইন পর্যন্ত সেখানেই পড়াশোনা করেন। এ সময়ে তিনি অসাধারণ মেহনত করেছেন। আসাতিযায়ে কেরাম ও মাদরাসার খিদমতে নিবেদিতপ্রাণ ছিলেন। একদিন তার সম্মানিত পিতার সঙ্গে মাদরাসার জমির পাট কাটতে গিয়ে হাতও কেটে ফেলেছিলেন। পাহাড়পুরে হুযূরের প্রিয়তম উস্তাদ ছিলেন হযরত মাওলানা আব্দুর রব্ব মদীনা হুযূর। শাইখ পাহাড়পুরী রহ.এর ইচ্ছা ছিল লালবাগ জামি'আয় ভর্তি হবেন। পিতার ইচ্ছা ছিল হাটহাজারীতে পাঠানো। অবশেষে এই শর্তে অনুমতি দিলেন যে, লালবাগ জামি'আয় তুমি হযরত হাফেজ্জী হুযূরকে মুরুব্বী মেনে চলবে।

পিতার শর্ত মেনে লালবাগ জামি'আয় এসে মিশকাতে ভর্তি হলেন। মাত্র বিশ বছর বয়সে দাওরায়ে হাদীস সমাপ্ত করেন। ফারাগাতের পর পাকিস্তান যাওয়ার ইরাদা পেশ করলে হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. বললেন, অনুমতি নেই। তিনি হুযূরকে জামি'আ নূরিয়ায় উস্তাদ নিযুক্ত করলেন। বছর শেষে হাফেজ্জী হুযূর নিজ থেকেই পাকিস্তান যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। সেখানে গিয়ে আল্লামা ইদরীস কান্ধলবী রহ. এবং আল্লামা ইউসুফ বানূরী রহ.এর বুখারীর দরসে শরীক হন। এছাড়াও পাকিস্তানের মুফতীয়ে আ'যম মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. ও আল্লামা রসূল খান রহ.এর সোহবত লাভে ধন্য হন। এরপর এক বছর মুলতানের খাইরুল মাদারিসে আল্লামা শরীফ কাশ্মীরী রহ.এর তত্ত্বাবধানে ফুনূনাত পড়েন। এছাড়াও হজ্জের সফরে একাকী হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.এর কাছে পূর্ণ বুখারী শরীফ পড়ার বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন।

ইলমে ওহী বিতরণে আত্মনিয়োগ

পাকিস্তান থেকে ফিরে এসে পুনরায় নূরিয়া মাদরাসায় দরস প্রদান শুরু করেন। ১৯৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সুদীর্ঘ আঠারো বছর তিনি নূরিয়ার শিক্ষাসচিবের দায়িত্ব সুচারুরূপে আঞ্জাম দেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিছুদিন নায়েবে মুহতামিমের দায়িত্বও পালন করেছিলেন। হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. তাকে দুনিয়ার সব ঝামেলা থেকে মুক্ত রেখে জামি'আ নূরিয়ার তা'লীম-তরবিয়াতের জন্য ওয়াকফ করে রেখেছিলেন। হাফেজ্জী হুযূরের তওবার রাজনীতির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে সারাদেশের আলেম সমাজ যখন

প্রচারণায় ব্যস্ত হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. তখনো তাকে নূরিয়ার বাইরে যেতে কড়াভাবে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। সর্বশেষ জনসভা ছিল বাইতুল মুকাররমে। পাহাড়পুরী হুযূর মনে করলেন, হযরতকে অনেক দিন দেখি না; আজ একটু সাক্ষাত করে আসি এবং সর্বশেষ জনসভাটি উপভোগ করে আসি। মঞ্চে যাওয়ার আগ মুহূর্তে শায়খের খাস কামরায় প্রবেশ করলেন। দেখামাত্রই শাইখ হাফেজ্জী চোখ রাঙিয়ে বললেন, তুমি এখানে কেন? তুমি শুধু মাদরাসায় পড়ে থাকবে। তিনি হযরত পাহাড়পুরীর কোনো ওযর গ্রহণ না করে তাকে তৎক্ষণাত মাদরাসায় পাঠিয়ে দিলেন। এভাবে তিনি নিজের সকল চাওয়া পাওয়া বিসর্জন দিয়ে ফুলে-ফলে সাজিয়ে তুলেছিলেন ঐতিহ্যবাহী জামি‘আ নূরিয়াকে। কিন্তু তাকদীর খণ্ডাবে সাধ্য কার! অনিবার্য কারণে সকলের অজান্তেই একসময় নূরিয়ার মায়া ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন এই দরদী মালী। নূরিয়া থেকে এসে মিরপুর মুসলিম বাজার মাদরাসায় অবস্থান করেন। এরপর মুহাম্মাদপুরের জামি‘আ মুহাম্মাদিয়ায় ছয় বছর, জামি‘আ রাহমানিয়ায় পাঁচ বছর, পাশাপাশি বড় কাটারা মাদরাসায় এবং লালমাটিয়া মাদরাসায়ও বুখারী শরীফের দরস দিতেন। গোটা তাদরীসী যিন্দেগী বিশেষত নূরিয়ার দিনগুলো তিনি সবসময় কিতাব মুতালাআয় ব্যস্ত থাকতেন। একদিন হযরত হাফেজ্জী হুযূর তাকে কুতুবখানায় গভীর মুতালাআয় নিমগ্ন দেখে বললেন, এমনটিই হওয়া উচিত। کتابوں کا کیڑا بن جاؤ কিতাবের পোকা বনে যাও।

শাইখ হাফেজ্জী রহ.এর সাথে দেহ ও আত্মার অটুট বন্ধন

ছাত্রজীবন থেকেই নিজেকে শাইখের হাতে সোপর্দ করে রেখেছিলেন। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক বাইয়াত হতে সাহস করেননি। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে একদিন লালবাগ শাহী মসজিদে আসলেন। হাফেজ্জী হুযূর তখন ছিলেন একাকী। আশপাশে অন্য কেউ নেই। এমনই এক শুভক্ষণে তিনি তাকে কাছে ডেকে বাইয়াত করে নেন। এ বছরই ২৪ মে হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ. নিজের আদরের দুলালী সর্বকনিষ্ঠ কন্যাকে তার হাতে তুলে দিয়ে পুত্র হিসেবে বরণ করে নেন।

আদর্শ মানুষ গড়ার মহান কারিগর

এই পরশ পাথরের ছোঁয়ায়, এদেশের অগণিত উলামা, তলাবা ও সাধারণ মানুষ সোনার মানুষে পরিণত হয়েছেন। তাদের অন্যতম হলেন, জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার স্বনামধন্য মুহতামিম মাওলানা হিফজুর রহমান (মুমিনপুরী) দা.বা., জামি‘আ রাহমানিয়ার শাইখে ছানী ও নাযিমে দারুল ইকামা মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক মানিকগঞ্জী দা.বা., মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ (আদীব সাহেব হুযূর) দা.বা., শাইখুল হাদীস আল্লামা হেলালুদ্দীন ফরিদপুরী দা.বা., মাওলানা সাঈদ আল মিসবাহ, মাওলানা নাসীম আরাফাত, মাওলানা শরীফ মুহাম্মাদ, মাওলানা ইয়াহইয়া ইউসুফ নদবী, মাওলানা আবূ তাহের রাহমানী, মাওলানা আশরাফ হালীমী প্রমুখ।

খোলাফায়ে কেরাম

পাহাড়পুরী হুযূর সর্বমোট ১২ জন সৌভাগ্যবানকে খিলাফত প্রদান করেছেন।

১. শাইখুল হাদীস মাওলানা আকরাম আলী দা.বা. (বাহিরদিয়া, ফরিদপুর)।
২. মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ দা.বা.।
৩. মাওলানা আব্দুল মালেক দা.বা. (মারকাযুদ্দাওয়া)।
৪. মাওলানা মুহিউদ্দীন শরীয়তপুরী।
৫. মাওলানা আহমাদুল্লাহ দা.বা. (জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়া)।
৬. মাওলানা আবরারুজ্জামান (মেজ সাহেবযাদা)।
৭. মাওলানা আব্দুল হালীম পাহাড়পুরী।
৮. মাওলানা আব্দুল হাই (উত্তরা, ঢাকা)।
৯. মাওলানা হাসান ফারূক।
১০. মাওলানা আব্দুল মুকীত।
১১. মাওলানা আব্দুর রহমান হানীফ (নরসিংদী)।
১২. মাওলানা আবুল ফাতাহ ভূঁইয়া।

রচনাবলী

জামি‘আ নূরিয়ায় মকতব-নাযেরায় দুই পদ্ধতিতে পাঠদান চলত। মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব সাহেব রহ.এর নাদিয়া ও কারী বেলায়েত সাহেব রহ.এর নূরানী, কিন্তু উভয়টি ছিল সময় সাপেক্ষ ও তিন বছর মেয়াদী। কুরআনের নাযেরা পড়ায় এতোটা বিলম্ব হাফেজ্জী হুযূরের মনপূত হল না। তিনি পাহাড়পুরী রহ.-কে নির্দেশ দিলেন উভয় প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এক বছর মেয়াদী একটি রূপরেখা তৈরি করতে। হযরত হাফেজ্জীর নির্দেশে তিনি দীর্ঘ সময় নিয়ে 'নূরিয়া নূরানী কায়েদা' সংকলন করেন। সারাদেশে তা ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করে। এখন এ কায়েদাটি মানুষ প্রতিবছর প্রায় এক লক্ষ কপি সংগ্রহ করে থাকে। নূরিয়া কায়েদা হুযূরের সেরা কৃতির একটি।

এছাড়াও হুযূরের স্বহস্তে লেখা মুসলিম শরীফের তাকরীরের পাণ্ডুলিপি, বুখারী ছানীর তাকরীরের পাণ্ডুলিপিও রয়েছে। 'আলহাদী ইলাস সরফ' ও 'আমার আম্মা' বই দু'টি বাজারে এসেছে। আরো কিছু মাওয়ায়েয, মালফূযাত আসবে ইনশা-আল্লাহ।

বিশিষ্ট জনদের দৃষ্টিতে...

আল্লামা সুলাইমান নো'মানী দা.বা. বলেন, তিনি ছিলেন হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.এর প্রতিচ্ছবি। তার মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশের কিছু নেই। মানুষ মাত্রই মরণশীল। তবে দুঃখ শুধু এ কারণে যে, তার শূন্যস্থান পূরণ হওয়ার নয়।

আল্লামা মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. বলেন, হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.-এর তাহকীকে ইলম, আমল ও বুযূর্গী ছিল সর্বজন স্বীকৃত। তাঁকে যারা জানেন, চেনেন এ ব্যাপারে তাদের কোনো দ্বিমত ছিল না।

আমার জানামতে ইলম, আমল ও বুযূর্গীর দিক থেকে হযরত হাফেজ্জী রহ.-এর সকল মুতা'আল্লেকীন ও মুহিব্বীনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন হযরত পাহাড়পুরী রহ.। তিনি ছিলেন হযরত হাফেজ্জীর প্রতিচ্ছবি। হাফেজ্জী হুযূর তার ওপর অগাধ আস্থা রাখতেন। তিনিও হাফেজ্জী হুযূরের একান্ত আশেক ও তার জন্য প্রাণোৎসর্গী ছিলেন। শেষ বয়সেও তার ধী-শক্তি এতোটা প্রখর ছিল যে, একবার রাহমানিয়ার খতমে বুখারীতে হুযূর তার সিলসিলায়ে সনদ নিজ থেকে নিয়ে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত টানা মুখস্ত শুনিয়েছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে হুযূর ও আমি পাশাপাশি নামায আদায় করি। হুযূর আমার জায়নামাযটি দেখে বললেন, 'সম্ভবত সাতমসজিদে আপনাকে এই জায়নামাযে নামায পড়তে দেখেছি।' ব্যাপারটি বাস্তবেও তা-ই, যেমনটি হুযূর বলেছেন। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, অসুস্থতাজনিত কারণে এ সময় হুযূরের দৃষ্টিশক্তি অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল। তবুও পনেরো ষোলো বছর আগে দেখা জায়নামায কোনও রকমে দেখেই চিনতে পেরেছেন।

আল্লামা হিফজুর রহমান মুমিনপুরী দা.বা. বলেন, হুযূরের পাঠদান পদ্ধতি এতোটা সাবলীল আর এতোটাই সাজানো ছিল যে, কঠিন থেকে কঠিন সবকও সব স্তরের ছাত্ররা বুঝতে পারত। সবসময় তিনি মাদরাসায়ই পড়ে থাকতেন। অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেন না; নীরবে মুতালাআয় লিপ্ত থাকতেন। অপরদিকে এত সহজ ছিলেন যে, ছাত্ররা নির্দ্বিধায় কাছে যেতে পারত। ছাত্রদেরকে খুব মহব্বত করতেন। তাদের প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। তিনি ইন্তিযামী কোন দায়িত্ব ও কোন পদ গ্রহণ করা পছন্দ করতেন না। মু'আমালার ক্ষেত্রে খুব স্বচ্ছ ছিলেন। কারো কোন আপত্তির সুযোগ নেই। তার চলাফেরা ছিল সাদামাটা। কখনো কারো সমালোচনা করতেন না। আজকের এই যুগে পাহাড়পুরী হুযূরের মত মহৎ ও মুশফিক উস্তাদ সহীহ তা'লীম ও তরবিয়াতের জন্য বড় প্রয়োজন।

মাওলানা শাহ আতাউল্লাহ দা.বা. বলেন, হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.এর মিশনকে বাস্তবায়ন করার জন্য তিনি নিজেকে ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। মানবদেহে যেমন আত্মা থাকে, দুনিয়ারও তেমন আত্মা আছে। তা হল যিকরুল্লাহ। আর যিকরুল্লাহ যাদের মাধ্যমে কায়েম থাকে তাদের ইন্তিকালে দুনিয়া মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। তেমনি একজন মহান বুযুর্গ হলেন পাহাড়পুরী রহ.। আমার বিশ্বাস, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়া থেকে পাক-পবিত্র করে নিয়ে নিয়েছেন।

মাওলানা আবূ তাহের মিসবাহ দা.বা. বলেন, আকাশে অনেক তারা আছে। তবে শুকতারা মাত্র একটি। অন্যের কথা জানি না; আমার জীবনের আকাশে তো তিনি ছিলেন সেই শুকতারা, সন্ধ্যাতারা এবং প্রভাততারা। একজনও তালিবে ইলম এমন পাইনি, যে বলেছে হুযূরের কাছে সমস্যার কথা বলতে গিয়েছি; কিন্তু এত ব্যস্ত ছিলেন যে, তার সময় হয়নি আমার কথা শোনার। তার শূন্যস্থান খুব সহজে পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। তার শাসন ছিল মায়ের মত কোমল, তরবিয়ত ছিল বাবার মত স্নেহসিক্ত। আর তিরস্কার ছিল বন্ধুর মত অন্তরঙ্গতায় আপ্লুত।

সবচেয়ে সুন্দর কী ছিল তার জীবনে? মুখের সেই হৃদয় শীতল করা হাসি। এমন হাসি আর কারো মুখে কি দেখতে পেয়েছি!

আমি তাকে দেখে পেয়েছি ভুল থেকে বেঁচে থাকার শিক্ষা। তখন তার প্রতি অনুভব করেছি সকৃতজ্ঞ শ্রদ্ধা। আমি তাকে দেখে পেয়েছি ভুল করে তার প্রায়শ্চিত্ত করার শিক্ষা। আর তখনো তার প্রতি অনুভব করেছি ভালোবাসায় সিক্ত শ্রদ্ধা।

মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব দা.বা. বলেন, হযরত পাহাড়পুরীর ইন্তিকাল শুধু একটি পরিবার বা একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য বিপর্যয় নয়; বরং গোটা উম্মাহর জন্যই বিপর্যয়। সকলের জন্যই অনেক বড় আঘাত। এ মুহূর্তে সকলেই সান্ত্বনা ও সমবেদনার মুহতাজ।

মুফতী দিলাওয়ার হুসাইন সাহেব দা.বা. বলেন, পাহাড়পুরী হুযূরের বিশেষ গুণ ছিল, বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি আর ছোটদের প্রতি স্নেহ-মমতা। তার মুখে জীবনে কারো গীবত শোনা যায়নি। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনুসৃত ব্যক্তি। তিনি ছিলেন আখলাকে নববীর প্রতিচ্ছবি।

প্রিয় পাঠক! আজ এ মহান বুযুর্গ আমাদের মাঝে নেই। গত ২৯ আগস্ট আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। বিপুল মানুষের ভীড় ও দুঃসহ এক শোকাভিভূত পরিবেশ সৃষ্টির আশঙ্কায় হযরতের স্বজনেরা রাত দশটার মধ্যেই দাফনকার্য সমাধা করার সিদ্ধান্ত নেন। রাতটি পার হলে আর এ ভীড় সামলানো কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। তারপরও শোকাহত মানুষের সে কি প্রচণ্ড ভীড়! চারদিক থেকে হাফেজ্জী, পাহাড়পুরী-প্রেমিক জনতার ঢল নেমেছিল। মাকবারায়ে হাফেজ্জীতে প্রিয় মুরশিদের পাশে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন উসওয়ায়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও ইলমে ওহীর সুউচ্চ হিমালয় হযরত পাহাড়পুরী রহ.। আল্লাহ তা'আলা তার কবরকে নূর দ্বারা ভরপুর রাখুন। তাকে জান্নাতের আ'লা মাকাম নসীব করুন। আমীন।

লেখক : মুদারসিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মদপুর-ঢাকা।

(৪৪ পৃষ্ঠার পর; মাহরূমীর কারণ)

৩. উস্তাদের সঙ্গে বেয়াদবী

এ যুগে ইলমের অধঃপতনের আরেকটি বড় কারণ হচ্ছে, বর্তমানে উস্তাদের সঙ্গে সম্পর্ক সাময়িক ও প্রয়োজন-নির্ভর হয়ে পড়েছে। অথচ উস্তাদের আদব-ইহতিরাম ও তার দু'আ ছাড়া ইলমের বরকত পাওয়া সম্ভব নয়। আর উস্তাদের সঙ্গে বেয়াদবী করা তো মারাত্মক অন্যায় ও ইলম থেকে মাহরূমির আলামত। হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. তার ইসলাহে ইনকিলাবে উম্মত গ্রন্থে উস্তাদের হক সম্পর্কিত এমন কিছু ত্রুটি উল্লেখ করেছেন যেগুলো ইলম থেকে মাহরূমির কারণ হয়ে থাকে। যথা-

ক. উস্তাদের আদব রক্ষা না করা।
খ. দেখা-সাক্ষাতে সালাম না দেয়া।
গ. উস্তাদের দিকে পিঠ দিয়ে বসা।
ঘ. তার সামনে পা ছড়িয়ে বসা।
ঙ. পুরোপুরি আনুগত্য না করা। যেমন, কিছু কথা মানা, কিছু কথা না মানা।
চ. মহব্বতে কমতি থাকা।
ছ. ধোঁকাবাজী করা।
জ. মিথ্যা বলা।
ঝ. ত্রুটি স্বীকার না করে অপব্যাখ্যা করা।
ঞ. খিদমতে কমতি করা।

তুহফাতুল উলামা গ্রন্থে হযরত থানবী রহ. কর্তৃক বাতলানো উস্তাদের হুকূক ও আদাব গুরুত্বের সাথে পড়ে তদানুযায়ী আমল করা উচিত।

৪. অহঙ্কার করা

অহঙ্কার অত্যন্ত নিকৃষ্ট আত্মার রোগ। হাদীসে এসেছে, আল্লাহ পাক বলেন, 'অহঙ্কার আমার চাদর। বড়ত্ব-মহত্ত্ব আমার ইযার। যে এটা টানবে (অর্থাৎ অহঙ্কার, বড়াইয়ে লিপ্ত হবে) আমি তাকে জাহান্নামে ছুড়ে ফেলব'। আলেমরাই এ রোগে বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। বলা হয়, آفة العلم الخيلاء অর্থ : ইলমের আপদ হচ্ছে অহঙ্কার। হযরত থানবী রহ. বলেন, 'অহঙ্কারশূন্য অজ্ঞতা, অহঙ্কারযুক্ত ইলম থেকে উত্তম'। তাই কোন আহলে নিসবত বুযুর্গের কাছে এই রোগের চিকিৎসা করা প্রয়োজন।

উপসংহার

দামী খাবার যেমন সুস্বাদু ও উপকারী হয়, তেমনি নষ্টও দ্রুত হয় এবং এর দুর্গন্ধও তীব্র হয়। তালিবে ইলমের মর্যাদা যেমন বিরাট, তার পদস্খলনও সেই অনুপাতে হয়। সুতরাং তালিবে ইলমির যামানায় কোন বুযুর্গ উস্তাদের পরামর্শে চলা এবং ফারেগ হওয়ার পর কোন আহলে নিসবত বুযুর্গের সাহচর্যে কিছুদিন কাটানো। তাহলেই দীনের প্রকৃত খাদিম হওয়া সম্ভব।

লেখক : নায়েবে মুহতামিম ও সিনিয়র মুহাদ্দিস, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট, মুহাম্মদপুর

অনুলিখন : মাওলানা উসামা বিন মীযান

সা ক্ষা ৎ কা র

সন্তানের চোখে হযরত পাহাড়পুরী রহ.

হযরতুল আল্লাম মাওলানা আব্দুল হাই পাহাড়পুরী রহ.-এর বড় সাহেবযাদা মাওলানা আশরাফুজ্জামান দা.বা. রাবেতা কর্তৃপক্ষের আমন্ত্রণে গত ১৬/১০/২০১৬ ইং রাবেতা কার্যালয়ে হুযূরের কর্মমুখর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাৎকার প্রদান করেন। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ব্যাপী এ সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন রাবেতা-প্রতিনিধি মাওলানা শফীক সালমান কাশিয়ানী। এতে উঠে এসেছে উলামা, তলাবা ও মুসলিম উম্মাহর অনুসরণীয় অনেক দিক। সাক্ষাৎকারের চুম্বকাংশ পাঠক সমীপে পেশ করা হল।

–সম্পাদক

রাবেতা : আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

মাও. আশরাফুজ্জামান : ওয়াআলাইকুমুস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ।

রাবেতা : আপনাকে মুবারকবাদ, জামি'আর আসাতিযায়ে কেরাম ও রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার পক্ষ হতে।

মাও. আশরাফুজ্জামান : আপনাদেরকে বহুত বহুত শোকরিয়া, অধমকে স্মরণ করার জন্য।

রাবেতা : আমরা আপনার আব্বাজান রহ.-এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আপনার কাছে কিছু জানতে চাই।

মাও. আশরাফুজ্জামান : আমি সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা করব। যত সময়ই লাগে আপনাদের সঙ্গে থাকব।

রাবেতা : হুযূরের ইন্তেকালের সময় আপনি হজ্জের সফরে ছিলেন। তো সংবাদটি কীভাবে পেলেন?

মাও. আশরাফুজ্জামান : সৌদি সময় তখন বেলা ১১.৩০। আব্বার ইন্তেকালের মুহূর্তে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। দেখি, আব্বাজান শ্বেত-শুভ্র পোশাকে পাগড়ি পরে হাদীসে নববীর দরস দিচ্ছেন। আজ আব্বাকে এতো উজ্জ্বল, এতো সুন্দর কেন লাগছিল, বুঝে উঠতে পারছিলাম না। মজলিসের সবাই শুভ্র পোশাক পরিহিত, যেন এক জান্নাতী দৃশ্য। তবে কাউকে চিনতে পারছি না। একটু পরেই দেখি, হাদীসে মসনদে আব্বাজান নন, তার শাইখ হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.। এই বৈচিত্র দেখে আমি অবাক হচ্ছিলাম। স্বপ্নেই একজন আমাকে বললেন, ভালোই দেখেছেন। ঘুম ভাঙতেই দেখি, বাংলাদেশে রেখে আসা আমার নিজের নাম্বার থেকে ফোনের পর ফোন। ব্যাক করলে আমার ভগ্নিপতি মাওলানা যাকারিয়া একটু গোপন করেই বললেন, আব্বার অবস্থা খুব খারাপ। কিন্তু আমি তো বুঝে ফেলেছি। এরপর ছোট ভাই আবরারুজ্জামানের সঙ্গে কথা হল। সে বলল, আব্বা তো এতোদিন অনেক কষ্ট করেছেন, আজ স্থায়ী শান্তির জায়গায় চলে গিয়েছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

রাবেতা : এই আশা জাগানিয়া স্বপ্নটিকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

মাও. আশরাফুজ্জামান : যে বছর জামি'আ নূরিয়াতে দাওরায়ে হাদীস খোলা হয়, আব্বার দায়িত্বে কোন কিতাব রাখা হয়নি। বুখারী সানী ছিল হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.-এর যিম্মায়। তিনি আব্বাকে বললেন, ভালো করে মুতালা'আ করে আমার দরসে বসবেন। আব্বাজান বরকত লাভের জন্য ছাত্রবেশে দরসে বসলেন। সবক শুরু হলে হাফেজ্জী হুযূর রহ. বললেন, আমি তো অসুস্থ, ভালো করে মুতালা'আও করতে পারি না তাই দরসে তাকরীর করবেন মাওলানা আব্দুল হাই। শোনে আব্বাজান তো আসমান থেকে পড়লেন। শরমে এতটুকুন হয়ে যাচ্ছেন। অবশেষে নিজ শায়খের আদেশ পালনার্থে তাকরীর আরম্ভ করলেন। হযরত হাফেজ্জী মন্তব্য করলেন, যথার্থ হয়েছে, কাল থেকে নিয়মিত বুখারী ছানীর তাকরীর করবেন। এভাবে তিনি আব্বাজানকে হাদীসের মসনদে বসিয়েছিলেন। এই স্বপ্ন থেকে আমার ধারণা, বিদায়ের সময়ও সেই হাফেজ্জী হুযূর রহ. দরসে হাদীসের মাধ্যমে তাকে আখেরাতে ইস্তিকবাল করেছেন, স্বাগত জানিয়েছেন।

রাবেতা : মৃত্যুসংবাদ পাওয়ার পর আপনার আমল কী ছিল?

মাও. আশরাফুজ্জামান : তখন আমার ভাবনা ও কল্পনার কেন্দ্রবিন্দু শুধুই আব্বাজান। তাকে ঘিরে আমার হৃদয়রাজ্যে স্মৃতির তুফান শুরু হয়েছিল। ব্যস, বাইরের সব প্রোগ্রাম বাদ। শুধু ইবাদত, যিকির, তিলাওয়াত ও তাওয়াফে সময় পার করেছি। আব্বাজানের ঈসালে সাওয়াবের জন্য শতাধিক তাওয়াফ করেছি।

রাবেতা : হুযূরের শৈশবকাল ও তালিবে ইলমীর যামানা সম্পর্কে দু' চার কথা?

মাও. আশরাফুজ্জামান : আব্বার মুখে শোনা। তিনি বলেছেন, দাদাজানের সামান্য আয় দিয়ে চলতো সংসার। অভাবের কারণে চালের সঙ্গে কাউন (সর্ষের আকারের এক প্রকার খাদ্যশস্য) মিশিয়ে ভাত রান্না করা হতো। মেহমানের আগমন ঘটলে চালুনী দিয়ে চেলে কাউনগুলো আলাদা করা হতো। কখনও গোলআলু চালের মতো কুচি কুচি করে ভাতের পাতিলে ছেড়ে দেয়া হতো পাতিল পূর্ণ করার জন্য। শুরুর দিকে আব্বা প্রখর মেধাবী ছিলেন না। কিন্তু খুব মেহনত করতেন। পাহাড়পুর মাদরাসায় পড়াকালীন বাদ আসর দূরের কোন মসজিদে চলে যেতেন। সেখানে অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশোনা করতেন। ক্ষুধাজনিত দুর্বলতার কারণে কখনও বেহুশ হয়ে পড়ে থাকতেন। পরে দাদাজান গিয়ে নিয়ে আসতেন। এই মেহনতের বদৌলতে আল্লাহ তা'আলা তার যেহেন খুলে দিয়েছেন।

রাবেতা : পরিবারের বড় সন্তান হওয়ায় আপনি হুযূরের কর্মজীবনের বড় একটা অংশ সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন, তার কিছু শুনিয়ে আমাদেরকে উপকৃত করবেন?

মাও. আশরাফুজ্জামান : আমার আম্মা হলেন আমীর শরীয়ত হযরত হাফেজ্জী রহ.-এর সর্বাধিক প্রিয় কন্যা। বিবাহের পর কিছুদিন হযরত হাফেজ্জী হুযূরের কেল্লার মোড়ের বাসায় ছিলেন। পরে নানাজান নূরিয়া মাদরাসার পেছনে টিন ও মুলি বাঁশের বেড়া দিয়ে একচালা একটি কাঁচা ঘর তৈরী করে দেন। সেখানে আম্মাজানকে নিয়ে আসলেন। মাঝে মাঝে দু' তিনদিন পর্যন্ত বিদ্যুৎ থাকতো না, সাপ্লাই পানি ছিল না। আব্বা কলসি ভরে মাদরাসা হতে পানি আনাতেন। আল্লাহ তা'আলা আমার আম্মাকে জাযায়ে খায়ের নসীব করুন, তিনিও নির্দ্বিধায় আব্বাকে সঙ্গ দিয়ে দারিদ্র্য উপভোগ করেছেন। (এ পর্যায়ে মাওলানা আশরাফুজ্জামান কান্নায় বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন। সঙ্গীদের অবস্থাও

তা-ই।) নূরিয়ায় যোগদানকালে আব্বার মাসিক অযিফা ছিল মাত্র আশি টাকা। যখন বাসা নিলেন তখন ২৫০ টাকার মতো। আব্বা তার গোটা জীবনে তালীম তরবিয়তের বাইরে অর্থকরী কোন কাজে মনোনিবেশ করেনি। কোন ওয়াজ মাহফিলে বা কোন মাদরাসায়ও যেতেন না। অতিরিক্ত আয়ের কোন পন্থা তিনি অবলম্বন করেননি। মাদরাসার সামান্য অযিফা দিয়েই কষ্ট করে চলতেন। কারো কাছে নিজের হালত পেশ করতেন না। বাসায় বাজার থাকতো না, আম্মা আমাকে নূরিয়া মাদরাসার বোর্ডিংয়ে পাঠাতেন ছাত্রদের খাওয়া শেষে বেঁচে যাওয়া ফেরত ভাত-ডাল আনার জন্য। কোনদিন বোর্ডিংয়ে মাছ দিলে মাছের নাড়ি-ভুড়ি যা বাবুর্চিরা ফেলে দেয়, আম্মা আমাকে পাঠাতেন তা আনার জন্য। সেগুলো আমাদেরকে রান্না করে দিতেন। আমি তখন ছোট ছিলাম, বুঝতাম না। আম্মার কথামতো নির্দ্বিধায় নিয়ে আসতাম। আজ বুঝি, আম্মা কতোটা নিরুপায় হয়ে আমাকে পাঠাতেন। ছোট সময় ভালো কোন পোশাক পরিধান করার তাওফীক হয়নি আমাদের। দশ-বারো টাকা গজ মূল্যের পলেস্টার কাপড় বানিয়ে দিতেন। আব্বাও অনেক কমদামি কাপড় পরতেন। দু' হাতের কনুইয়ের দিকে ছেঁড়া ব্যতীত কোন জামা আমি বাদ দিতে পারিনি।

১৯৮৩ সালের কথা। একবার আমি পড়ে গিয়ে ভীষণ ব্যথা পেলাম। রাতে যন্ত্রণায় চিৎকার করছিলাম। আব্বার কাছে কোন টাকা ছিল না যে, আমার চিকিৎসা করাবেন। পরে নানা হাফেজ্জী হুযূর রহ. খবর পেয়ে বাসায় এসে চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। আমাকে বিশ টাকার দু'টি নোট হাদিয়া দিলেন। আমি তো যেন সোনার হরিণ পেয়েছি। আমার আব্বা আমাকে বুঝিয়ে সে টাকা সংসারের কাজে খরচ করলেন। আরেকবার বিশেষ উপলক্ষে নানাজান আমাকে তিনশত টাকা হাদিয়া দিয়েছিলেন। ভাই-বোনদের কাপড়-চোপড় নেই। আব্বার হাতেও কোন টাকা ছিল না। আব্বা ইচ্ছা করলে আমাকে ধমক দিয়ে টাকাগুলো নিতে পারতেন। কিন্তু আব্বা দীর্ঘক্ষণ আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলেন। অনেকভাবে বোঝালেন যে, তুমি এই টাকা দিয়ে কী করবে? তুমি যদি টাকাগুলো আমার কাছে দাও তাহলে সবার জন্য নতুন কাপড় কেনা যাবে। একপর্যায়ে আমি রাজি হলাম। আব্বা টাকাগুলো দিয়ে আমাদের সবার জন্য কাপড় কিনলেন। সেদিন বুঝিনি এই অনুনয় বিনয়ের মর্ম। আজ বুঝি যে, একজন পিতা কতোটা অসহায়ত্ব বোধ করলে, কতোটা বিপর্যয়ে পড়লে অবুঝ সন্তানের উপঢৌকনের টাকা নিতে পারেন! অবাক হই আমার আম্মার সবর ও অল্পতুষ্টি দেখে। তিনি কখনও তার পিতা হযরত হাফেজ্জীর কাছে তার দারিদ্র্য পীড়িত জীবনের চিত্র তুলে ধরেননি। নানাজান বিভিন্ন সময় নিজেই খোঁজ-খবর রাখতেন।

১৯৯১ সালে নূরিয়া মাদরাসা থেকে আব্বা চলে যান মিরপুর মুসলিম বাজার মাদরাসায়। মাদরাসার অদূরে এক জীর্ণশীর্ণ বাসায় থাকতেন। সেখান থেকে আসা-যাওয়া করে মুহাম্মদপুর জামি'আ মুহাম্মাদিয়ায় দরস দিতেন। শিয়া মসজিদ থেকে কলেজগেট পর্যন্ত পায়ে হেঁটে যেতেন। সেখান থেকে লোকাল বাসে মিরপুর। এভাবে আজীবন আসা-যাওয়া করেছেন। অনেক সময় বাসায় বাজার থাকতো না। মুসলিম বাজারের আশপাশে তখন ডোবা-নালা ছিল। এতো ঘর-বাড়ি হয়নি। ডোবার কিনারে বিভিন্ন ধরণের শাকপাতা জন্মে থাকে। আব্বার সাথে থাকতো রহমত ভাই। আব্বা সেগুলো তুলে বাসায় আনাতেন তরকারী হিসেবে রান্নার জন্য। ২০০৪ সাল পর্যন্ত এই হালতেই চলেছে। এর পর থেকে একটু একটু সচ্ছলতা আরম্ভ হয়েছে। এছাড়াও হাজারো ঘটনা রয়েছে যেগুলো তিনি এই দীর্ঘজীবনে ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবেলা করেছেন।

রাবেতা : হুযূরের কাশফ ও কারামত সম্পর্কে কিছু বলবেন?

মাও. আশরাফুজ্জামান : আব্বাজানের সবচেয়ে বড় কারামত– ইত্তিবায়ে সুন্নাত। তিনি কখনও সুন্নাত পরিপন্থী কোন কাজ করেছেন এমনটি দেখা যায়নি। এছাড়াও আব্বাজানের আরও কিছু কারামত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তিনি যে কোন স্বপ্নের ব্যাখ্যা যেভাবে করতেন বাস্তবেও তেমনটি হতো। তার আরেকটি কারামত ছিল, কঠিন মুহূর্তেও কখনও রাগ হতেন না। কেউ তার সঙ্গে উত্তেজিত হয়ে কথা বললে তিনি মাথা নিচু করে শুনতেন। কথা শেষ হলে আব্বা তাকে মৃদু স্বরে বোঝাতেন।

অস্বাভাবিক কোন পেরেশানী আসলে নামাযে দাঁড়িয়ে যেতেন। নামায শেষ হতে না হতেই সমাধান হয়ে যেতো। একবার আমার এক ভাগনী অপহৃত হয়। বাসার সামনে থেকে তাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। বয়স মাত্র আড়াই বছর। কোথাও খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আব্বা জানতে পেরে নামাযে দাঁড়ালেন। নামায শেষ হলে দরজায় আওয়াজ হল। দেখা গেল, কে বা কারা তাকে দরজার সামনে রেখে গেছে।

তিনি যখন যেখানে যেতেন পরিবেশ তার অনুকূল হয়ে যেতো, যেন দুনিয়াতে তার কোন দুশমন নেই। সবাই তাকে মহব্বত করতো।

একবার আব্বা-আম্মা উমরার সফরে ছিলেন। সাথে আবরারও ছিল। ফেরার সময় এয়ারপোর্টে এসে দেখা গেল, আব্বার ফিরতি টিকেটের টাকা জমা হয়নি। আব্বা তো জমা দিয়েছেন কিন্তু টিকেটে তা উল্লেখ নেই। অন্যদের ঠিক আছে। সবাই বিমানে উঠে পড়েছে। একটু পরই বিমান ছেড়ে দিবে। আব্বাকে নতুন করে টিকেট করতে অথবা কর্মকতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলা হল। অবস্থা এই দাঁড়াল যে, যেটাই করতে যান এই বিমানে আর যাওয়ার সুযোগ নেই। সফরসঙ্গীরা কেউ আব্বাকে ছাড়া আসতে রাজি নন। আব্বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'আ করছেন আর ভাবছেন কী করবেন। ইতোমধ্যে হঠাৎ একব্যক্তি এসে আব্বাকে বললেন, দেখি আপনার টিকেট। তারপর তিনি দ্রুত সিল মেরে অফিসিয়াল ঝামেলা মিটিয়ে দিলেন। আব্বা ঐ ফ্লাইটেই দেশে আসলেন।

রাবেতা : হুযূরের স্বভাবজাত কিছু গুণাবলী জানতে চাই।

মাও. আশরাফুজ্জামান : আব্বা খুব নরম স্বরে কথা বলতেন। ছাত্রদেরকেও আপনি বলে সম্বোধন করতেন। একজন মানুষের কণ্ঠ এতোটা কোমল এবং এতোটা মিঠা হতে পারে তা সরাসরি তার মুখ থেকে না শোনলে বোঝানো মুশকিল। আব্বাজান খুব বেশি বেশি শুকরিয়া জ্ঞাপন করতেন। কোন নেয়ামত হাসিল হলে এমনকি খানার ফাঁকে ফাঁকে, চা পানের দু' চুমুকের বিরতিতে বারবার আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ বলতেন। কেউ কোন উপকার করলে এতো বেশি জাযাকাল্লাহ বলতেন, তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন, বিভিন্ন দু'আ দিতেন যে, ঐ ব্যক্তি শরম বোধ করতেন।

আব্বাজান হযরত পাহাড়পুরী রহ.-এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল কেউ কোন কাজের জন্য পরামর্শ চাইলে বিষয়টি শরীয়ত

পরিপন্থী না হলে নিষেধ করতেন না। এর অশুভ পরিণাম বা ফলাফল কী হবে তা বলে নিরুৎসাহিত করতেন না। যেহেতু মূল কাজটি বৈধ আর সে আগ্রহ করে করতে চাচ্ছে এজন্য আব্বা তার আগ্রহকে প্রত্যাখ্যান করতেন না। এজন্য অনেক বিষয় এমন মনে হবে যে, এর সঙ্গে পাহাড়পুরী হুযূরের সম্পৃক্ততা রয়েছে বা তিনি এর পৃষ্ঠপোষক। আসলে ব্যাপারটি এমন নয়। আব্বার সম্পৃক্ততা শুধু এতটুকু যে, তিনি স্বভাবজাত কোমলতা ও সরলতার কারণে না বলেননি।

রাবেতা : হযরত পাহাড়পুরী রহ. হারামাইন শরীফাইনের পাশাপাশি অন্য কোন্ কোন্ দেশ সফর করেছেন?

মাও. আশরাফুজ্জামান : ১৯৭৫ সালে আব্বাজান সর্বপ্রথম হজ্জের সফর করেন হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.-এর সঙ্গে। এ সফরে কুয়েতে এক সপ্তাহের যাত্রাবিরতী ছিল। এ সময় কুয়েতের বিভিন্ন স্থানে দীনী কাজ করেছেন।

১৯৮৪ সালে আব্বা একাকী ইরান সফরে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি সেমিনারে তিনি ফারসী ভাষায় অত্যন্ত সারগর্ভ আলোচনা করেন। ফারসী ভাষায় তার অসাধারণ দক্ষতা দেখে উপস্থিতিগণ মুগ্ধ হয়েছিলেন। স্মর্তব্য যে, এটা হযরত হাফেজ্জী হুযূরের সেই বিখ্যাত ইরান সফর নয়। সেটি হয়েছিল ১৯৮২ সালে, আব্বা সে সফরে ছিলেন না। তো ১৯৮৪-এর এই সফরে ভারতের প্রখ্যাত দাঈ ইলাল্লাহ ড. কালিম সিদ্দীকী দা. বা.এর সঙ্গে আব্বাজানের সাক্ষাত হয় এবং আব্বার প্রতি তার অকৃত্রিম ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। ড. কালিম সিদ্দীকী সাহেব কিছুদিন পরই লন্ডনে একটি ইসলামিক কনফারেন্সের আয়োজন করতে যাচ্ছিলেন। এই পরিচয়ের সুবাদে তিনি আব্বাকে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ জানান। আব্বাজান এত বড় যিম্মাদারী নিতে অপারগতা প্রকাশ করে বললেন, যদি আমার শাইখ হযরত হাফেজ্জী হুযূরকে দাওয়াত দেন তাহলে তার সফরসঙ্গী হিসেবে আমি আসতে প্রস্তুত আছি। ড. সাহেব রাজি হলেন। অতঃপর আব্বা ইরান থেকে থাইল্যান্ড গেলেন। সেখানে দাওয়াতী কাজে ১৫ দিন অতিবাহিত করে দেশে ফিরে আসেন।

হযরত হাফেজ্জীর সঙ্গে ঐতিহাসিক লন্ডন সফর

ড. কালিম সিদ্দীকী সাহেব হযরত হাফেজ্জীকে দাওয়াত দিতে বাংলাদেশে আগমন করলেন। দেশের বড় বড় উলামায়ে কেরামও ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আয়োজকদের পক্ষ হতে হযরত হাফেজ্জী হুযূর এবং পাহাড়পুরী হুযূর এ দুজনকে দাওয়াত দেয়া হল। উপস্থিত উলামায়ে কেরাম মহব্বতানা আন্দাযে আবেদন করলেন, হযরতের সঙ্গে শুধু মাওলানা আব্দুল হাই সাহেব যাবেন, তো আমরা কী অপরাধ করলাম! হযরতকে আমরা এই শর্তে যেতে দেবো যে, হযরতের সঙ্গে আমাদের প্রতিনিধি দলও নিতে হবে। প্রতিনিধি দলে হযরত হাফেজ্জী হুযূরের দোভাষী ছিলেন প্রফেসর হযরত হামিদুর রহমান দা.বা.। যাহোক সেই ঐতিহাসিক সফরের এই ছিল পেক্ষাপট। লন্ডন থেকে ফেরার কয়েক দিন আগে প্রফেসর সাহেব সবার পাসপোর্ট মিলিয়ে দেখলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, সবার পাসপোর্টে ভিসার মেয়াদ এক মাস আর আব্বাজানের মেয়াদ ছয় মাস।

লন্ডন প্রবাসী পাহাড়পুরী হুযূর

প্রফেসর সাহেব তখন হযরত হাফেজ্জী হুযূরকে বললেন, দুলাভাইয়ের ভিসার মেয়াদ তো ছয় মাস! হাফেজ্জী হুযূর বললেন, তাহলে আপনার দুলাভাইকে রেখে যাই। আব্বাজান ভেবেছেন তারা মজাক করছেন। কিন্তু না, হযরত হাফেজ্জী রহ. একেবারে হুকুমই করে বসলেন–নিশ্চয়ই খোদায়ী কোন ইশারা আছে, আপনি থেকে যান। কোথায় থাকবেন, কী করবেন কোন ব্যবস্থা না করেই আব্বাকে রেখে তারা সবাই দেশে চলে আসলেন। প্রিয় শাইখকে বিদায় দিয়ে আব্বা ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কোথায় যাবেন, কী করবেন দিশা না পেয়ে এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে গন্তব্যহীন হাঁটা দিয়েছেন। আল্লাহর কারিশমা! কিছুক্ষণের মধ্যেই রাস্তায় দেখা হয় আব্বার ঘনিষ্ঠ ছাত্র, নূরিয়ার ফারেগ কামরাঙ্গীর চরের মাওলানা ফজলুর রহমানের সঙ্গে। মাওলানা সাহেব তো আব্বাকে দেখে হতবাক, আব্বাও তাকে পেয়ে...। হুযূর! কোত্থেকে কীভাবে এলেন? এই তো হাফেজ্জী হুযূরকে বিদায় দিয়ে। বলেন কি, হাফেজ্জী হুযূর! কোথায়, কবে কিছুই তো জানতে পারিনি। সব শোনে আব্বাকে তিনি বাসায় নিয়ে গেলেন। আব্বা সেখানে থাকতে লাগলেন। প্রায় দেড় মাস পরে ইস্ট লন্ডনে একটি দীনী খিদমতের ব্যবস্থা হল। আব্বা সেখানে মসজিদ নির্মাণ করে পাশে একটি মাদরাসা চালু করেন। লন্ডনের উলামায়ে কেরাম শাইখ হাফেজ্জীর জামাতাকে পেয়ে উজ্জীবিত হলেন। তারা সিদ্ধান্ত নিলেন আব্বাকে আর ছাড়বেন না। এ উদ্দেশ্যে ভিসার মেয়াদও বাড়িয়ে নিয়েছেন। তারা আব্বাকে দিয়ে বড় জামি'আ বা ইসলামী ইন্সটিটিউট গড়ার পরিকল্পনা করেছেন। বাংলাদেশ থেকে পরিবারের সবাইকে নিয়ে যাওয়ারও তোড়জোড় শুরু করেছেন। মাত্র দশ মাস পার হয়েছে। এমন সময় আব্বার হাতে হযরত হাফেজ্জী রহ.-এর একটি চিঠি পৌঁছল। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে ঘটে গেছে বহু অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা। খেলাফত আন্দোলন ভেঙে গেছে। লালবাগ জামি'আর পাশাপাশি নূরিয়া মাদরাসারও শাইখুল হাদীস ছিলেন শাইখুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক রহ.। তিনিও নূরিয়া থেকে চলে এসেছেন। এ অস্থির সময়ে নূরিয়ার ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন হযরত হাফেজ্জী হুযূর তাঁর আশা-ভরসার কেন্দ্রস্থল পাহাড়পুরীর কাছে চিঠি লিখলেন- 'এখন আমি আপনার জরুরত অনুভব করছি। চিঠি পাওয়ামাত্রই যথাদ্রুত বাংলাদেশে চলে আসুন।' শায়খের নির্দেশ পেয়ে আব্বা ওখানকার সব প্লান-প্রোগ্রাম ছেড়ে দেশে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কিন্তু লন্ডনওয়ালারা কিছুতেই আব্বাকে ছাড়বে না। এমনকি তারা আব্বার পাসপোর্টও লুকিয়ে রেখেছে। এভাবে সপ্তাহখানেক পার হয়ে গেল। আব্বা পেরেশান। অগত্যা তিনি কৌশল অবলম্বন করলেন– আচ্ছা, আমাকে কি উমরা করতেও যেতে দিবেন না! যা হোক আল্লাহর ঘরের মেহমানকে তো আর বাধা দেয়া যায় না। তারা উমরার ব্যবস্থা করে আব্বাকে পাঠিয়ে দিলেন। আব্বা সেখান থেকে আর লন্ডনে ফিরে যাননি, সোজা বাংলাদেশে চলে আসেন।

হযরত হাফেজ্জীর অভিব্যক্তি: আমার হায়াত ফিরে এসেছে।

পাহাড়পুরী হুযূর দেশে ফিরছেন। ইস্তেকবালের জন্য স্বয়ং হযরত হাফেজ্জী রহ. এয়ারপোর্টে গেলেন। বিবরণ স্বয়ং পাহাড়পুরী রহ.এর যবানীতেই শুনুন–'এয়ারপোর্টে নেমে কাঁচের দেয়ালের ওপাশ থেকে দেখি, হুযূর দেয়ালের ওপাশে চেয়ারে বসে আছেন। আমি বের হয়ে আসতেই বুকে জড়িয়ে কেঁদে ফেললেন। জানলাম, তিনি তিন-

চার ঘণ্টা ধরে এখানে অবস্থান করছেন। এরপর বিভিন্ন বিষয়ে তার কিছু কষ্টের কথা শোনালেন এবং আমার হিম্মত বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উপদেশ দিলেন।'

আবার শুরু হল আব্বাজানের নূরিয়ায় দরস প্রদান। সকালে দুই ঘণ্টা বিকেলে দুই ঘণ্টা করে পূর্ণ বুখারী শরীফ একাই পড়াতেন। এদিকে দেশে চলে এসেছেন জানতে পেরে হাফেজ্জী হুযূরের কাছে লন্ডন থেকে লোকও এসেছিল আব্বাকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। কিন্তু হাফেজ্জী হুযূর আর যেতে দেননি।

লন্ডনে থাকাকালীন আব্বার কাছে কিছু টাকা জমেছিল। হাফেজ্জী হুযূরের পরামর্শে তা দিয়ে কামরাঙ্গীর চরে এক টুকরো জমি খরিদ করে রেখেছিলেন। নূরিয়া থেকে চলে আসার পর সেই জমি বিক্রি করে মিরপুরে একটি জমি খরিদ করেন। এটাই আব্বার জীবনের একমাত্র সঞ্চয়, আমাদের মাথা গোজার ঠাঁই। আর কামরাঙ্গীর চরের বর্তমান বাড়িটি নানাজান আম্মাকে দিয়েছিলেন। সেটি আম্মার সম্পদ।

রাবেতা : হুযূরের কোন মিশন, যার জন্য তিনি জীবনভর অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন?

মাও. আশরাফুজ্জামান : হযরত হাফেজ্জী হুযূর রহ.-এর ঐতিহাসিক ও বিপ্লবী ঘোষণা– ৬৮ হাজার গ্রামে ৬৮ হাজার নূরানী মক্তব কায়েম করো– আব্বা এই কুরআনী আন্দোলনকে বেগবান করার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। এ লক্ষ্যে তিনি আলমারকাজুল ইলমী নামে একটি প্রতিষ্ঠানের গোড়াপত্তন করেন। সারা দেশে নূরিয়া পদ্ধতিতে কুরআনের আলো ছড়িয়ে দেয়ার মহান এই মিশন ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে। মানিকগঞ্জের সিংগাইরে ৮৯ শতাংশ জমির ওপর তার বর্তমান অবস্থান। এছাড়া দীনী কিতাবাদি প্রকাশনার জন্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন আলহাদী প্রকাশনী।

রাবেতা : হুযূরের পারিবারিক জীবন সম্পর্কে কিছু বলবেন?

মাও. আশরাফুজ্জামান : আমরা তিন ভাই আট বোন। আব্বা নিজেই আলমারকাজুল ইলমী এবং আলহাদী প্রকাশনী দেখাশোনার যিম্মাদারী আমাকে দিয়েছেন। আর মেজো ভাই মাওলানা আবরার অন্য সব ক্ষেত্রেই আব্বার স্থলাভিষিক্ত। ছোট ভাইটি এখনও পড়াশোনা করছে। পারিবারিক জীবনে আব্বা সব সময়ই আম্মার সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিতেন এবং আম্মার মতামতকে মূল্যায়ন করতেন। ২০০৮ সালের পর থেকেই মূলত আব্বাজান আখেরাতের সফরের জন্য প্রস্তুতি শুরু করেছেন। যাবতীয় টাকা-পয়সা, আয়-ব্যয় সব আম্মার হাতে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। যেখান থেকেই কোন টাকা-পয়সা আব্বার হাতে আসতো তিনি তা আম্মার হাতে দিয়ে দিতেন। আর যেখানে যা খরচ করার প্রয়োজন হতো আম্মা আমাদের মাধ্যমে করাতেন। বাজার-সদাই যাবতীয় কিছু ২০০৮ সাল থেকে আম্মার যিম্মায়। আব্বা দুনিয়ার সব ঝামেলা থেকে নিজেকে ফারেগ করে নিয়েছিলেন। ইন্তেকালের কিছুদিন আগে তিনি মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব দা.বা.কে আমাদের পরিবারের অভিভাবক বানিয়ে গেছেন। আব্বার অবর্তমানে সবকিছু তার পরামর্শ মোতাবেক হবে।

রাবেতা : সন্তান হিসেবে আপনাদের উদ্দেশ্যে তাঁর কোন বিশেষ নসীহত?

মাও. আশরাফুজ্জামান : নসীহতের উদ্দেশ্যে আব্বাজান এ আয়াতটি বেশি বেশি বলতেন,

وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ

অর্থ : তোমরা প্রকাশ্য ও গুপ্ত উভয় প্রকার পাপ ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই যারা পাপ কামাই করে, তাদেরকে শীঘ্রই সেই সমস্ত অপরাধের শাস্তি দেয়া হবে, যাতে তারা লিপ্ত হয়। (সূরা আন'আম- ১২০)

আমি যখন হাফেয হলাম, একদিন আব্বার সঙ্গে নৌকায় পার হচ্ছিলাম। আব্বা আমাকে বললেন– 'শোনো, তুমি হাফেয হয়েছো, আল্লাহ তা'আলার অনেক বড় নেয়ামত পেয়েছো। এই কুরআনের বিনিময়ে একটা পয়সাও যেন কোনদিন তোমার পকেটে না যায়। আল্লাহ তা'আলা রিযিকে বরকত দিবেন।'

আব্বার এই নসীহতটি আমার হৃদয়ে এমনই বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, আমি অনেক ধনাঢ্য এলাকায় তারাবীহ পড়িয়েছি, আব্বার নসীহতের কথা স্মরণ করে একটা টাকাও কখনও গ্রহণ করিনি।

রাবেতা : হুযূর সাধারণত কোন আমলের প্রতি বেশি তাগিদ দিতেন।

মাও. আশরাফুজ্জামান : আব্বা সব সময় কম খাওয়া, কম কথা বলা, যিকির তিলাওয়াত ও নফল নামাযের প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। (আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হযরতের পদরেখা ধরে এগিয়ে যাওয়ার তাওফীক দান করুন।)

রাবেতা : এতো ব্যস্ততার মধ্যেও এতো দীর্ঘ সময় দেয়ার জন্য আপনাকে অশেষ শোকরিয়া, জাযাকাল্লাহ ফিদ্ দারাইন।

মাও. আশরাফুজ্জামান : আপনাদেরকেও বহুত বহুত শোকরিয়া, আব্বাজানের স্মৃতিচারণের একটা সুন্দর উপলক্ষ তৈরি করে দিয়েছেন

(৩৭ পৃষ্ঠার পর; কিতাবুল ঈমান)

গুনাহে কবীরা ইত্যাদির সুবিন্যস্ত তালিকা পেশ করেছেন। সেখানে ২৯টি শির্কী কাজ, ১৫টি বিদআতী কাজ, ৬৫টি জাহেলী রুসূম ও ১২৩টি কবীরা গুনাহের তালিকা দিয়েছেন। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যাও প্রদান করেছেন।

শেষ অধ্যায়ে তিনি কুরআন-হাদীসের স্পষ্ট বাণী ও বলিষ্ঠ যুক্তির আলোকে অত্যন্ত জোরালোভাবে বর্তমান বিশ্বে চলমান-গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদের অসারতা প্রমাণ করেছেন। এসব মতবাদ যে ঈমান-ইসলাম ও মানবতা বিরোধী এবং সম্পূর্ণ অযৌক্তিক তা তিনি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। বিশেষ করে গণতন্ত্রের ভ্রান্তি ও অসারতা প্রমাণে তিনি কুরআনে কারীমের ১৭টি আয়াত ও যথেষ্ট পরিমাণ হাদীস উল্লেখপূর্বক এক নাতিদীর্ঘ আলোচনা পেশ করেছেন। সেই সঙ্গে দেশপ্রধান, আমীরুল মু'মিনীন বা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইসলামের নূরানী তরীকা ও পদ্ধতি কি তা-ও সবিস্তারে তুলে ধরেছেন।

প্রিয় পাঠক! গ্রন্থটির বিষয়, বিন্যাস ও বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে সামান্য ইঙ্গিত ও ধারণা দেয়া হল। এতেই অনুমিত হচ্ছে, গ্রন্থটি বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের জন্য কতো উপকারী ও কতোটা জরুরী। কাজেই একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, প্রতিটি মুসলমানের ঘরেই এই গ্রন্থটি থাকা উচিত। কারণ, ঈমান ও ঈমানসংশ্লিষ্ট জরুরী বিষয়াদি ভালোভাবে জানা ও তদানুযায়ী আমল করা প্রতিটি মুসলমানের উপর ফরয। আর কিতাবটিতে সেগুলোই আলোচিত হয়েছে। কতো ভালো হতো, যদি মুসলমানদের ঘরে ঘরে, মসজিদে মসজিদে এবং তা'লীমের হালকায় অন্যান্য কিতাবাদির পাশাপাশি কিতাবুল ঈমানেরও নিয়মিত তা'লীম হতো!

আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে কিতাবটি বারবার পাঠ করার এবং সে অনুযায়ী আমল করে ঈমান-আকীদা বিশুদ্ধ করত ঈমান নিয়ে কবরে যাওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন! ইয়া রব্বে কারীম।

লেখক : মুদাররিস, আশরাফুল মাদারিস, সতীঘাটা, যশোর

হ জ্জে র স ফ র না মা

হিজাযের মুসাফির

মুফতী সাঈদ আহমাদ

দুর্বল বান্দার হজ্জের সফর 'হিম্মতে বান্দা, মদদে খোদার' সমুজ্জ্বল নিদর্শন। হজ্জের সফর– সফরের আগেও যেমন স্বপ্ন স্বপ্ন লাগে, পরেও স্বপ্ন স্বপ্নই মনে হয়। এ স্বপ্নের ঘোর কাটতে সময় লাগে। অনেকে ঘোর না কাটতেই আবার স্বপ্ন দেখা শুরু করে এবং স্বপ্নের পর স্বপ্ন তাদের পূরণও হয়। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন। আমীন।

ঘামঝরানো প্রস্তুতি, আবেগময় যাত্রা, ক্লান্তিকর সফর, উষ্ণ বায়ুর হিজাযী অভ্যর্থনা, মুআল্লিমের বেরসিক আতিথেয়তা, অতঃপর আলোকময় হারামের দর্শন পাওয়ামাত্র সব ক্লান্তি, সকল কষ্ট বেমালুম ভুলে যাওয়া, সবশেষে বাইতুল্লাহর দর্শনে নিজেকেই হারিয়ে ফেলা। শুনেছি এ পর্বে অনেক দক্ষ মুফতী, বিজ্ঞ হজ্জ প্রশিক্ষকের আমলেও উলট-পালট হয়ে যায়। এটা মূলত আত্মহারা হওয়ার পরিণতি। নিজেকে সামলানো মুশকিল হয়ে যায়। পরে অবশ্য সকলেই নিজের মত করে রুটিন বানিয়ে নেয়। কার আগে কে হারাম শরীফে যাবে, কে বেশি সংখ্যক তাওয়াফ করবে, বাইতুল্লাহর কত নিকটে নামায আদায় করবে এ নিয়ে অঘোষিত এক প্রতিযোগিতাও চলতে থাকে। আর হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের মত ঝুঁকিপূর্ণ কাজে আগ্রহীর সংখ্যাও নগণ্য নয়। পরে হজ্জের দিনসমূহে লাব্বাইক লাব্বাইক ধ্বনি তুলে মিনা, আরাফা, মুযদালিফা হয়ে শয়তানের বিরুদ্ধে পাথর ছুঁড়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা, প্রচণ্ড গরম আর টয়লেট স্বল্পতায় অস্থির হয়ে যাওয়া এবং তাঁবু ছেড়ে বাসায় ফিরে আসার জন্য ব্যাকুল হওয়া, ফিরে এসে এবার নিজের দেশে কিংবা সোনার মদীনার সোনালী সফরের ইন্তিজামে ব্যস্ত হওয়া, সোনার মদীনার সবুজ গম্বুজের স্নিগ্ধতা, নববী মসজিদের নয়নাভিরাম দৃশ্যাবলী, রওযায়ে আতহার আর রিয়াযুল জান্নাহর আবেগময় উপস্থিতি, জান্নাতুল বাকীর ভাব-গাম্ভীর্যতাসহ অগণিত স্মৃতি হিজায ফেরত প্রকৃত মুসাফিরের হৃদয়কে অনেকদিন কাঁদায়। যোগ্য মুসাফিরগণের পূণ্যময় এ সফরের প্রতিটি কদমের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতায় থাকে অন্যদের জন্য অতি মূল্যবান শিক্ষা, উপদেশ এবং দিল-দেমাগ ও আত্মার জন্য লোভনীয় খোরাক, যা বিতরণের উদ্দেশ্যে তারা তাদের মূল্যবান সফরনামা লিখেন ও প্রকাশ করেন। সে দৃষ্টিকোণ থেকে আমার মত লোকের সফরনামা লেখা হাস্যকর প্রয়াস ছাড়া কিছুই নয়। তা সত্ত্বেও ভাবলাম, বড়দের বড় বড় উপদেশপূর্ণ সফরনামা পড়ার মত বড় মন যাদের নেই, তাদের কেউ হয়তো ক্ষুদে মুসাফিরের ক্ষুদ্র সফরনামা হতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দু-চারটি কথা গ্রহণযোগ্য মনে করবে। এ উদ্দেশ্যেই কলমের কালি খরচ করা আর পাঠকের কিছুটা সময় নেয়া। তা-ও ধারাবাহিক একটি সফরনামা হিসেবে নয়; বরং কয়েকটি সফরের সামষ্টিক কিছু অনুভূতি, যাতে পাঠকের কিছু উপকার হবে বলে আশা করি।

এক.

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল ইবাদতের মধ্য থেকে একমাত্র হজ্জ ও উমরার নিয়ত কীভাবে করতে হবে তা মৌখিক উচ্চারণের মাধ্যমে শিখিয়েছেন। যে নিয়তের মধ্যে 'সহজ করুন' ও 'কবুল করুন' এ দু'টি দু'আ যুক্ত করে দিয়েছেন। প্রথমটি দ্বারা বোঝা যায়, হজ্জ ও উমরার সফর ও কার্যক্রম সব সময়ই কষ্টকর হবে। চাই তা ঘোড়া, গাধা ও উটের যুগে হোক, চাই রেলওয়ে ও পানির জাহাজের যুগে কিংবা উড়োজাহাজ ও রকেটের যুগে। তেমনিভাবে ঊষর-মরু, কুপ-কুয়াঁ আর তাঁবুর আমলে হোক কিংবা স্কেলেটর, এয়ারকন্ডিশন আর থ্রি, ফোর ও ফাইভ স্টার হোটেলের আমলে। হ্যাঁ, আল্লাহ তা'আলা যদি নিজ অনুগ্রহে সহজ করে দেন তাহলেই কেবল সহজ হবে। অন্যথায় কোটা নির্ধারণ, প্রাক নিবন্ধন, ফার্স্ট ক্যারিয়ার, থার্ড ক্যারিয়ার, ব্যালটি, নন-ব্যালটি, সাধারণ, ভিআইপি কোন কিছুতেই সহজ হওয়ার নিশ্চয়তা নেই। কাজেই দু'আটি সর্বযুগে হজ্জ, উমরার সব সফরকারীদের জন্যই প্রযোজ্য। এ দু'আ যার পূর্ণ কবুল হবে তার সফরই সহজ হবে।

অপর দু'আ তথা 'কবুল করুন' দ্বারা বোঝা যায়, মাকবূল হজ্জ-উমরা খুব সহজ বিষয় নয়। মাকবূল হজ্জ-উমরার ফযীলত যেমন ঈর্ষণীয়, হজ্জ-উমরার কবুলিয়্যাতের বিষয়টিও তেমন ঝুঁকিপূর্ণ। সামর্থ্য আছে বলে গেলাম, থাকলাম, ফিরে এলাম এতেই সদ্যপ্রসূত শিশুর মত নিষ্পাপ হয়ে আসা আর পরকালে জান্নাত নিশ্চিত হয়ে যাওয়া– ব্যাপারটা ঠিক এমন নয়। বরং কুরআন-সুন্নাহ ও বুযুর্গদের বক্তব্য অনুসারে হজ্জ-উমরা কবুল হওয়ার লক্ষণ হল, মুসাফিরের জীবনের গতি-প্রকৃতি সম্পূর্ণ আখিরাতমুখী হওয়া। আখিরাতমুখী হওয়ার অর্থ হল, জীবনযাত্রা নিজ খেয়াল-খুশির পরিবর্তে শরীয়তের অধীনে হয়ে যাওয়া। আর শরীয়তের অধীনে হওয়ার একমাত্র মাধ্যম হল শরীয়ত বিশেষজ্ঞ আলেমগণের পরামর্শ অনুযায়ী চলা।

এবার চিন্তা করুন, হজ্জের কারণে কয়জন হাজীর জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে, কতজন হাজী শরীয়তের মোটামুটি পাবন্দি করে এবং ভক্তি-শ্রদ্ধার সাথে আলেমগণের সাথে সম্পর্ক গড়ে।

পাপকাজ ছাড়ার ফিকির নেই, আলেম-উলামার সাথে সম্পর্ক নেই, মনে চাইলে কিছু ইবাদত-বন্দেগী সুযোগ-সুবিধামত করে নিলাম, আর আশা রাখলাম যে, আমার হজ্জও মাকবুল হজ্জ হয়েছে। আমিও এমন সদ্যজাত নিষ্পাপ শিশুর মত নিষ্পাপ মানুষ। আমার জন্যও জান্নাত প্রায় নিশ্চিত। ইসলাম ধর্মে কোন ইবাদতের পর এমন ধারণার কোন সুযোগ নেই। অন্যথায় যীশুখ্রিস্টের আত্মবলিদানের কল্পিত আকীদায় বিশ্বাসী নাসারাদের মধ্যে আর মুসলমানদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকবে না।

সেন্টপলের অনুসারী খ্রিস্টানদের বিশ্বাস হল, মানবজাতির আদিপিতা হযরত

আদম আ. আল্লাহ তা'আলার নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে গন্দম খেয়ে অপরাধ করেছেন, ফলে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। সে আদমের বংশধর সকলে মাতৃগর্ভ থেকেই অপরাধী হিসেবে জন্ম নেয়। যে যাবত তাদের জন্মগত পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হবে এদের কারোই জান্নাতে যাওয়ার অধিকার নেই। আর কোন মানব সন্তান এ প্রায়শ্চিত্তের জন্য উপযুক্ত নয়। কারণ সে নিজেই জন্মসূত্রে পাপী। কাজেই খোদাবন্দ নিজ সন্তান যীশুকে (নাঊযুবিল্লাহ) বলিদানের মাধ্যমে মানব বংশের জন্মগত পাপের প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেছেন। এখন যে মানব সন্তান যীশুখ্রিস্টের আত্মবলিদানের আকীদায় বিশ্বাসী হবে, সে ব্যক্তিগতভাবে যত পাপই করুক না কেন, খোদাবন্দের কাছে নিষ্পাপ বলে গণ্য হবে এবং সে স্বর্গ পাবে। আর যে এ আকীদায় বিশ্বাসী নয়, সে যত নিষ্পাপ জীবন যাপন করুক না কেন, জন্মগত পাপ কখনো মোচন হবে না এবং স্বর্গেও ঠাঁই পাবে না। প্রমাণের জন্য দেখুন 'ত্রাণকর্তা যীশুখ্রিস্টের নতুন নিয়ম, ১ যোহন ২:২। (সূত্র : শেখ মুহাম্মাদ আব্দুল হাই কর্তৃক সংকলিত 'সত্যের সন্ধানে'; পৃষ্ঠা ১২৫)

ইসলাম ধর্মে কিন্তু এ জাতীয় কোন আকীদা বা আমলের অস্তিত্ব নেই, যা বিশ্বাস করলে বা আমল করলে আর যত পাপই করুক, কোন পাপ ধর্তব্য হবে না। ইসলাম বাস্তব জীবন ধর্মের নাম। ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা হল, প্রত্যেকটি মানব শিশু জন্মসূত্রে নিষ্পাপ। শৈশবেও থাকে নিষ্পাপ, শরীয়তমতে সাবালক হওয়ার পর তার পাপ-পূণ্যের খাতা খোলা হয়। ঈমানদার হয়ে সে খাতায় পূণ্যের অ্যাকাউন্ট খুলতে হয়। ঈমানদার না হলে সে খাতায় জান্নাত প্রাপ্তির যোগ্য কোন পূণ্য লেখা হয় না। আর ঈমানদার হলে পাপ-পূণ্য দুটোই লেখা হয়। অতি পূণ্যময় কোন কাজ করলে তার দ্বারা কিছু পাপ মিটিয়ে দেয়া হয় বটে, কিন্তু পরবর্তী সকল পাপের বৈধতার লাইসেন্স দিয়ে দেয়া হয়– এমনটি কখনো নয়।

কাজেই মাকবুল হজ্জ করতে পারলে শিশুর মত নিষ্পাপ হওয়ার অর্থ যে পরবর্তী জীবন পাপমুক্তভাবে যাপনের তাওফীক পাওয়া– একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আর যে হাজীর হজ্জ পরবর্তী জীবন পাপমুক্ত অবস্থায় যাপনের ফিকির নেই, চেষ্টা নেই তার হজ্জ কবুল না হওয়ার যে ঘোর আশঙ্কা আছে এটা সহজেই অনুমেয়। এজন্যই নিয়তের সময়েই কবুলিয়্যাতের আবেদন করতে শেখানো হয়েছে। চিন্তার বিষয় হল, কয়জন হাজী নিয়তের সময় এ মর্ম মনে রেখে 'কবুল করুন' বলে থাকি!

অবশ্য ইসলাম ধর্মে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত হতাশার স্থান নেই। ঈমান-আমলের যেকোন ত্রুটি যে কোন সময় সংশোধনের পূর্ণ সুযোগ তাতে রাখা আছে। শর্ত হল, সংশোধন হতে হবে কুরআন-সুন্নাহয় বর্ণিত নিয়মে। এ নিয়ম জানার জন্য যেতে হবে বিশেষজ্ঞ আলেমের কাছে। বিকল্প কোন রাস্তা নিরাপদ নয়।

দুই.

বাইতুল্লাহ যিয়ারতের জন্য শরীয়ত কর্তৃক দু'টি প্যাকেজ নির্ধারিত আছে। একটি সংক্ষিপ্ত প্যাকেজ, অপরটি বিস্তৃত প্যাকেজ। প্রথমটির নাম উমরা। দ্বিতীয়টি হজ্জ। কুরআনে পাকের সূরা তাওবার ৩নং আয়াতে দ্বিতীয়টিকে হজ্জে আকবর তথা বড় হজ্জ নামে অভিহিত করা হয়েছে। বোঝা গেল, শরীয়তের পরিভাষায় হজ্জে আকবর তথা বড় হজ্জ বলতে পারিভাষিক হজ্জকেই বোঝানো হয়। সে হিসেবে উমরা হল হজ্জে আসগর তথা ছোট হজ্জ। (দ্রষ্টব্য : মা'আরিফুল কুরআন; আয়াত সংশ্লিষ্ট তাফসীর)

কিন্তু আমাদের সমাজে হজ্জে আকবর বা আকবরী হজ্জ বলতে বোঝায়, যে হজ্জে ৯ই যিলহজ্জ শুক্রবারে হয়। সে হিসেবে অন্যান্য বছরের হজ্জগুলো আসগরী হজ্জ তথা ছোট হজ্জ হওয়ার কথা। মনে রাখতে হবে, শরীয়তের পরিভাষা কিন্তু এমন নয়। হ্যাঁ, ৯ই যিলহজ্জ শুক্রবারে হওয়ার ফযীলত আছে; সেটা ভিন্ন কথা।

তিন.

হজ্জ করবো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য; হাজী খেতাব পাওয়ার জন্য নয়। এতদসত্ত্বেও আমাদের সমাজে হজ্জ আদায়কারীকে হাজী সাহেব বলা হয়। এতে যদি হাজী সাহেবের মনে বড়ত্বের অনুভূতি না জাগে তাহলে তেমন সমস্যার কথা নয়। আলোচ্য হাজী শব্দের আরবী রূপ হল আলহাজ্জ। অতএব হাজী ও আলহাজ্জ একই কথা। কিন্তু কারো কারো মাঝে এমন একটা ধারণা বিদ্যমান যে, একবার দু-বার হজ্জ করলে হয় হাজী আর তিন বা ততোধিক বার হজ্জ করলে হয় আলহাজ্জ। এ ধারণাটি মোটেও সঠিক নয়।

চার.

শরীয়তের দৃষ্টিতে হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য যদিও শারীরিক সামর্থ্যের পাশাপাশি নির্দিষ্ট পরিমাণ আর্থিক সামর্থ্যও শর্ত। উভয় শর্তে সামর্থ্যবানের জন্য হজ্জ পালনে বিলম্ব করা গুনাহের কাজ। এছাড়া শারীরিক ও আর্থিক সামর্থ্য ছাড়াও কেউ যদি যে কোন উপায়ে হজ্জের দিনসমূহে বাইতুল্লাহর যিয়ারতে ও হজ্জের মৌলিক কার্যাদি সম্পাদনে সক্ষম হয়ে ফরয হজ্জ আদায়ের নিয়তে হজ্জ করে ফেলে তাহলে তার হজ্জ ফরয হিসেবেই আদায় হয়ে যায়। পরে শর্ত মাফিক সামর্থ্যবান হলেও তার উপর পুনরায় হজ্জ আদায় করা ফরয নয়; বরং পরবর্তীতে আদায়কৃত হজ্জ নফল। কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা হল, সামর্থ্যের শর্তের তুলনায় আল্লাহ প্রদত্ত তাওফীকই এখানে মূল ফ্যাক্টর। আর তাওফীক এমন লোকেরই হয়, যে অদম্য স্পৃহা নিয়ে দৌড়-ঝাঁপ শুরু করে দেয়। কত সামর্থ্যবানকে দেখি, যুগের পর যুগ পার করে দেয়; তাওফীক প্রাপ্ত হয় না। আর কতো বাহ্যিক সামর্থ্যহীন আল্লাহর বান্দাকে দেখি বারবার যিয়ারতে হারামাইনের সৌভাগ্যে ধন্য হয়। খোদ অধমও এ শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। কাজেই প্রিয় পাঠককে বলি, আপনার যদি এ সৌভাগ্য লাভের আগ্রহ থাকে তাহলে চেষ্টা-তাদবীরে নেমে পড়ুন। আর দু'আ করতে থাকুন। দেখবেন, শীঘ্রই আপনার এ সাধ পূর্ণ হয়ে গেছে। উপমহাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম কওমী মাদরাসা দারুল উলূম করাচীর স্বনামধন্য মুহতামিম (পরিচালক) পাকিস্তানের বর্তমান মুফতিয়ে আ'যম মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের যবান থেকে শুনেছি, হযরত রফী উসমানী সাহেব সবেমাত্র শিক্ষাপর্ব শেষে দারুল উলূমে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হয়েছেন। কর্মজীবনের একদম শুরু সময়। কোন রকম চলার যোগ্য অল্প বেতন। এ সময়

তাঁর শ্রদ্ধেয় পিতা মুফতিয়ে আ'যম মুফতী মুহাম্মাদ শফী রহ. হজ্জের সফরে যাচ্ছিলেন। বিদায় দেয়ার সময় পিতার কাছে বিশেষ দু'আর আবেদন করলেন যেন শীঘ্রই আল্লাহ তা'আলা তাঁকে হজ্জের তাওফীক দেন। পিতা হযরত মুফতী সাহেব রহ. বললেন, শুধু দু'আয় কাজ হবে? কিছু দাওয়াইও তো লাগবে! তুমি প্রস্তুতি কী নিচ্ছ, যে তোমার জন্য হজ্জের দু'আ করবো? তিনি বললেন, আমি যে বেতন পাই তাতে তো আমার কোন রকম চলে যায়; কোন উদ্বৃত্ত থাকে না। তো আমি দু'আ চাওয়া ছাড়া আর কী প্রস্তুতি নেবো? হযরত মুফতী সাহেব রহ. বললেন, হজ্জে যেতে চাইলে এ আয়ের মধ্য থেকেই কিছু কিছু করে সঞ্চয় করতে থাকো। তিনি বললেন, ইনশা-আল্লাহ চেষ্টা করবো। মুফতী সাহেব রহ. বিদায় নিয়ে চলে গেলেন এবং হজ্জ করে ফিরে এলেন। পরের বছর যখন হজ্জের প্রস্তুতি শুরু হল, তখন হযরত মুফতী সাহেব রহ. রফী উসমানী সাহেবকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার হজ্জের জন্য কত রুপি জমা করেছো? তিনি জবাব দিলেন, এক হাজার রুপি মাত্র। (তখন হজ্জের খরচ ছিল সর্বসাকুল্যে আনুমানিক চার হাজার রুপি)। হযরত মুফতী সাহেব রহ. বললেন, পাসপোর্ট বানিয়ে নাও এবং হজ্জের প্রস্তুতি নাও। তিনি বললেন, এ অল্প রুপিতে হজ্জ হবে কী করে? হযরত মুফতী সাহেব রহ. বললেন, বাকী রুপি কারো কাছ থেকে ঋণ করে নাও। আল্লাহ তা'আলা ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিবেন। শ্রদ্ধেয় পিতার পরামর্শ অনুযায়ী তিনি তাই করলেন এবং সে বছরই জীবনের প্রথম হজ্জ আদায় করে আসলেন। পরে যথাসময়ে ঋণও পরিশোধ করলেন। শুধু তাই নয়; তিনি বলেন, সেই যে প্রথম হজ্জের ঋণ শোধ করেছি সে থেকে আজ ষাটোর্ধ্ব বয়সী জীবনে আরো কতোবার আল্লাহ তা'আলা হজ্জ-উমরার তাওফীক দান করেছেন। দেশ-বিদেশে কত সফর করেছি। জীবনযাত্রায় কত অগ্রগতি হয়েছে। কিন্তু এ যাবত আর কোন দিন কোন প্রয়োজনে ঋণ করতে হয়নি। আশা করি বাকি জীবনেও ঋণের প্রয়োজন হবে না।

প্রিয় পাঠক! হযরত মুফতী মুহাম্মাদ রফী উসমানী দামাত বারাকাতুহুমের যবান থেকে জুমু'আর বয়ানে আমি এ ঘটনা শুনেছি আজ থেকে বিশ বছর পূর্বে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে। তিনি আজো বেঁচে আছেন। দু বছর আগেও বাংলাদেশ সফর করে গেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি আর কখনো অর্থ ঋণের মুখাপেক্ষী হননি। এটা হজ্জের জন্য ঋণ করার বরকত। বস্তুত হযরতের এ বয়ানই আমার হজ্জ সফরের হিম্মতের মূল উৎস। তবে পার্থক্য হল, তিনি ঋণ করেছেন মাত্র একবার। আর আমার ঋণ করতে হয় বারবার এবং আল্লাহর বিশেষ মেহেরবানীতে প্রতিবারই যথাসময়ে সে ঋণ শোধ করার তাওফীক হয়ে যায়। এর ফলে আমার সাহস ক্রমেই বৃদ্ধি পায়। আশা করি যতবারই এ মুবারক সফরের জন্য ঋণ করব ততবারই আল্লাহ তা'আলা শোধ করার ব্যবস্থা করে দিবেন। শুধু তাই নয়; বরং জীবনে যে প্রয়োজনেই ঋণ করি না কেন ইহকাল ত্যাগ করার পূর্বে আল্লাহ তা'আলা সে ঋণ শোধ করে যাওয়ার তাওফীক দান করবেন। পাঠকের কাছেও নেক পরিণতির জন্য দু'আ চাই।

পাঁচ.

অধমের প্রথম হজ্জের সফরে পরম এক হিতাকাঙ্ক্ষী প্রায় অর্ধেক খরচ বহন করেছিলেন স্বপ্রণোদিত হয়ে। তিনিই আমাকে হজ্জে যাওয়ার জন্য আগাম উৎসাহ প্রদান করেছিলেন। সে বছর হজ্জের প্যাকেজ ছিল দু লক্ষ একুশ হাজার পাঁচশত টাকা। তন্মধ্যে তিনি প্রদান করেছেন এক লক্ষ টাকা। তিনি আমার বাসায় এসে এক লক্ষ টাকার কচকচে বান্ডেল আমার হাতে তুলে দিলেন। বিপরীতে আমি তাকে হাদিয়া দিয়েছিলাম ছোট্ট একটি পাকা কাঁঠাল। কাঁঠাল পেয়ে মনে হল, সেদিন আমার চেয়ে তিনিই বেশি খুশি হয়েছেন। এ যাবত আমার জীবনে একসাথে এত টাকা হাদিয়া পাওয়ার ঘটনা এ একটাই। তিনি আমাকে সীমাহীন ভালোবাসতেন। আমার প্রতি ভালোবাসায় তিনি গর্বিতও ছিলেন। আমিও তার জন্য, তার সন্তান ও পরিবারের জন্য অন্তর থেকে দু'আ করতাম, এখনো করি। গত হজ্জের সফরেও তার নাম নিয়ে উত্তম জাযার জন্য দু'আ করেছি। তার ছেলেদেরকে দেখলে আদর করি। তাদের কাছে পরিবারের অন্যদের খোঁজ-খবর নিই। আমি তার ইহসান কোনদিন ভুলবো না ইনশা-আল্লাহ।

বিগত কয়েক বছর থেকে আমি কিছু লোকের চরম প্রতিহিংসার শিকার। ব্যক্তিগত কোন কারণে নয়; বরং সম্পূর্ণ দীনী কারণে। কারো বিদআতী আবদার পূরণ করতে পারি না। আর আলেম ও পেশাগত নামের মর্যাদা রক্ষার্থে কিছু লোকের অহেতুক তোয়ায করি না। আমার জানামতে, এটাই আমার অপরাধ। এছাড়া দূরত্বের যৌক্তিক কোন কারণ নেই। তাদের সাথে আমার আত্মীয়তার কিংবা লেনদেনের কোন সম্পর্ক নেই। তাদের সাথে সে অহেতুক বিরোধের সময় থেকে আমার প্রথম হজ্জের সে প্রিয় মুহসিন কেন যেন আমাকে একটু এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেন। তাঁর এ এড়িয়ে চলা ক্রমেই যেন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আমার ধারণায় আমার প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ কোন বন্ধুর দ্বারা তিনি প্রভাবিত হচ্ছেন। ভালো হতো যদি তিনি আমার সাথে এ বিষয়ে খোলামেলা আলাপ করতেন। বন্ধুত্বের দাবীও ছিল তাই। কারো দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কারো প্রতি ভুল বোঝাবুঝির ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দেশ হল, প্রথমে অভিযুক্তের নিকট থেকে যাচাই করা। শরীয়তের এ নির্দেশ না জানার কারণে বা উপেক্ষা করার কারণে আজ কত নিরপরাধকে অপরাধী মনে করা হচ্ছে। কত আস্থার সম্পর্ক বরবাদ হচ্ছে। কত মানুষ অন্যের ক্ষতি করতে গিয়ে মূলত নিজেই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি বিরাগী বন্ধুদেরকেও শুভবুদ্ধি দান করুন। আমার ত্রুটিগুলোও সংশোধন করে নেয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন।

(চলবে ইনশা-আল্লাহ)

লেখক : নায়েবে মুফতী,
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া,
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

এ যুগের মাসায়েল

শেয়ার ব্যবসা

ফাতাওয়া বিভাগ : জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

মুহাম্মদ খায়রুল আলম
সিনিয়র এক্সিকিউটিভ, আই সি টি ডিভিশন, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লি., মতিঝিল, ঢাকা

প্রশ্ন : মুফতী মনসূরুল হক দা.বা. লিখিত 'ইশা'আতুসসুন্নাহ' কিতাবের ১৫৮ পৃষ্ঠায় শেয়ারের শরঈ বিবরণ সম্পর্কে লিখা হয়েছে, '*পক্ষান্তরে বর্তমান শেয়ারবাজারে শেয়ারসমূহ সংশ্লিষ্ট কোম্পানী থেকে প্রায় স্বতন্ত্র। এখানে শেয়ারের মূল্যায়ন ভিন্নভাবে হয়। দেশের আর্থিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি, গ্রাহকের চাহিদ বা অনীহা– এসব বিষয়ের প্রভাব শেয়ারের ক্ষেত্রে এক রকম, আর কোম্পানীর ক্ষেত্রে আরেক রকম। কোম্পানীর লাভ-লোকসানের সাথে শেয়ার-মূল্যের উত্থান বা পতনের কোনো সামঞ্জস্য থাকে না। শেয়ারবাজারে যারা শেয়ার ক্রয়-বিক্রয় করে তাদের অধিকাংশের ধারণায়ও একথা থাকে না যে, সে কোম্পানীর আনুপাতিক অংশের ক্রয়-বিক্রয় করছে। এ সকল দিক-বিবেচনা করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বর্তমান শেয়ারবাজারে শেয়ারের বাস্তবতা হল–শুধু সার্টিফিকেট কিংবা শেয়ার সংখ্যা। এ ছাড়া আর কিছু নয়।*'

এখানে প্রথম লাইনে বলা হয়েছে যে, শেয়ার বাজারের শেয়ারসমূহ সংশ্লিষ্ট কোম্পানী থেকে প্রায় স্বতন্ত্র। অর্থাৎ কোম্পানীর শেয়ার মূল্য বাড়া বা কমার সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই, যার ভিত্তিতে শেষ লাইনে উপসংহার টানা হয়েছে যে, বর্তমান শেয়ার বাজারের বাস্তবতা হল–শুধু সার্টিফিকেট কিংবা শেয়ার সংখ্যা। এছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু বাজার পর্যালোচনা করলে একথার অসারতা প্রমাণিত হয়। এখনো বাংলাদেশের শেয়ার বাজারে ঐ সকল কোম্পানীর মূল্যই সবচেয়ে বেশি যেগুলো প্রত্যেক বছর অধিক হারে মুনাফা দেয় এবং কোম্পানীর নেট অ্যাসেট ভ্যালু, শেয়ার অনুপাতে আয় (ই.এস.পি) বেশি যা কিনা শেয়ার হোল্ডারের কোম্পানীতে মৌলিকভাবে আনুপাতিক অংশের উপর নির্ভর করে। তবে একথা অনস্বীকার্যভাবে সত্য যে, শেয়ারের দাম বাড়া বা কমার উপর শুধুই কোম্পানীর লাভ বা লোকসানের উপর নির্ভর না করে বাজারের অন্যান্য অনুষঙ্গের উপরও অর্থাৎ রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বাজারে তারল্য প্রবাহ, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, কিছু ক্ষেত্রে গুজব, সিন্ডিকেট ব্যবস্থা ইত্যাদির উপরও নির্ভর করে যা হওয়া উচিত ছিল না।

কিন্তু উপরোক্ত লেখায় শেয়ারের দাম বাড়া বা কমার ক্ষেত্রে কোম্পানীর মৌলিক ভিত্তি অর্থাৎ কোম্পানীর আর্থিক অবস্থাকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে, যা আসলে শেয়ার মার্কেট সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে ভুল বলেই প্রতীয়মান হবে বলে আমার বিশ্বাস।

আমাদের পর্যবেক্ষণ হল, শেয়ার মার্কেটে শেয়ারের দাম বাড়া-কমার ক্ষেত্রে দুটি উপাদান কাজ করে।

১.কোম্পানীর মৌলিক ভিত্তি অর্থাৎ কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা। প্রতি বছর দেয়া লভ্যাংশ এবং নেট অ্যাসেট ভ্যালু, শেয়ার অনুপাতে আয় (ই.পি.এস)

২.বাজারের অন্যান্য অনুষঙ্গ অর্থাৎ রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বাজারে তারল্য প্রবাহ, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, কিছু ক্ষেত্রে গুজব, সিন্ডিকেট ব্যবস্থা ইত্যাদি।

শেষ লাইনে উপসংহার টানা হয়েছে '*এসকল দিক বিবেচনা করলে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, বর্তমান শেয়ারবাজারে শেয়ারের বাস্তবতা হল–শুধু সার্টিফিকেট কিংবা শেয়ার সংখ্যা। এ ছাড়া কিছু নয়।*'

বর্তমান বাজারের বাস্তবতা যদি শুধুই সার্টিফিকেট কিংবা শেয়ার সংখ্যা হতো তাহলে ভালো (অর্থাৎ বেশি নেট অ্যাসেট ভ্যালু এবং প্রতি বছর অধিক হারে ডিভিডেন্ড দেয়) এবং খারাপ (অর্থাৎ কম নেট অ্যাসেট ভ্যালু এবং প্রতি বছর নিম্ন হারে ডিভিডেন্ড দেয়) কোম্পানীর শেয়ার মূল্যে কোন তারতম্য থাকতো না। কিন্তু বাজার পর্যালোচনা করলে সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র পাওয়া যায় যে, শেয়ারের মূল্য বাড়া বা কমার ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত ১নং কারণ অর্থাৎ কোম্পানীর মৌলিক ভিত্তিই মূল ভূমিকা পালন করে অর্থাৎ কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা, প্রতি বছর দেয়া লভ্যাংশ এবং নেট অ্যাসেট ভ্যালু। সাথে সাথে ২নং কারণ অর্থাৎ বাজারের অন্যান্য অনুষঙ্গ রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বাজারে তারল্য প্রবাহ, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, কিছু ক্ষেত্রে গুজব, সিন্ডিকেট ব্যবস্থা ইত্যাদিও একটা ভূমিকা পালন করে থাকে।

কেস স্টাডি হিসেবে গ্রামীণ ফোন, বাটা সু কোম্পানী, ঝিল বাংলা, বীচ হ্যাচারীস এ চারটি কোম্পানীর শেয়ারের দাম পর্যালোচনা করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে আশা করি। (মূল পশ্নপত্রে ৮টি পৃষ্ঠায় এ চার কোম্পানীর তথ্য উপাত্ত সংযোজিত রয়েছে।) এতে দেখা যাচ্ছে, উক্ত চারটি কোম্পানীর সবগুলোর ফেসভ্যালু সমান ১০ টাকা হলেও তাদের নেট অ্যাসেট ভ্যালু এবং কোম্পানীর ডিভিডেন্ড দেয়ার হার ভিন্ন হওয়ার কারণে গ্রামীণফোন-এর দাম ২৫০ টাকার আশেপাশে, বাটা সু-র ডিভিডেন্ড দেয়ার হার এবং নেট অ্যাসেট ভ্যালু, ই.পি.এস গ্রামীণফোনের চেয়ে বেশি হওয়ার কারণে বাটা সু-র দাম ১১৫০ টাকার আশেপাশে। বাটা সু এবং গ্রামীণফোন দুই কোম্পানীর ফেসভ্যালু সমান হলেও বাটা'র মূল্য গ্রামীণফোনের চেয়ে অনেক বেশি। কারণ, এর নেট অ্যাসেট ভ্যালু এবং কোম্পানীর ডিভিডেন্ড দেয়ার হার গ্রামীণফোনের চেয়ে অনেক বেশি।

অন্যদিকে বীচ হ্যাচারীসের দাম ১৪ টাকার আশেপাশে। কারণ, এর ডিভিডেন্ড দেয়ার হার এবং নেট অ্যাসেট ভ্যালু, ই.পি.এস অত্যন্ত কম। আর ঝিল বাংলার দাম ৬ টাকার আশেপাশে। কারণ, গত কয়েক বছরে এই কোম্পানী কোন ডিভিডেন্ড দেয় নাই, নেট অ্যাসেট ভ্যালু মাইনাস। অথচ এই সময় ২ নং কারণ অর্থাৎ বাজারের অন্যান্য অনুষঙ্গ রাজনৈতিক পরিস্থিতি, বাজারে তারল্য প্রবাহ, দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা, কিছু ক্ষেত্রে গুজব, সিন্ডিকেট ব্যবস্থা ইত্যাদি সকল কোম্পানীর ক্ষেত্রে সমান ছিল।

সুতরাং উপরোক্ত তথ্য উপাত্ত পর্যালোচনা করে বোঝা যায় যে, শেয়ার সার্টিফিকেট কোন স্বতন্ত্র জিনিস নয়। অর্থাৎ শেয়ারের দাম বাড়া কমার সাথে অবশ্যই কোম্পানীর মৌলিক ভিত্তি যেমন: প্রত্যেক বছর প্রদেয় ডিভিডেন্ড এবং কোম্পানীর অ্যাসেট ভ্যালু, শেয়ার অনুপাতে আয় (ই.পি.এস) এগুলোই মূল ভূমিকা পালন করে থাকে।

আশা করি এ ব্যাপারে যথাযথ পর্যালোচনা পেশ করবেন।

উত্তর : ইশা'আতুস সুন্নাহ কিতাবের ১৫৮ পৃষ্ঠায় কোম্পানীর লাভ-লোকসানের সাথে শেয়ারমূল্যের উত্থান-পতনের সামঞ্জস্যহীনতাকে সাব্যস্ত করা

হয়েছে। আর আপত্তি করা হয়েছে সম্পর্কহীনতার মাধ্যমে। সামঞ্জস্যহীনতা আর সম্পর্কহীনতা দুটি ভিন্ন বিষয়।

উক্ত কিতাবে 'কোম্পানীর লাভ লোকসানের সাথে শেয়ারমূল্যের উত্থান বা পতনের কোন সামঞ্জস্য থাকে না' বলে একথা বুঝানো হয়েছে যে, কোম্পানীর লাভ লোকসানের কারণে শেয়ার মূল্যের উত্থান বা পতন যে হারে হওয়া উচিত ছিল সেই হারে হয় না। বরং অধিকাংশ সময় দেশের আর্থিক অবস্থা, রাজনৈতিক পরিস্থিতি বা সিন্ডিকেট ব্যবস্থা ইত্যাদির কারণে শেয়ার মূল্য তার স্বাভাবিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। যার ফলে কোম্পানীর লভ্যাংশ স্বল্প হলেও বিভিন্ন পরিস্থিতির শিকার হয়ে শেয়ার মূল্য কখনো লভ্যাংশের তুলনায় অনেক বেশি বেড়ে যায়। আবার কখনো লভ্যাংশ বেশি হলেও বাজারের বিভিন্ন পরিস্থিতির কারণে শেয়ার মূল্য লভ্যাংশের তুলনায় অনেক কমে যায়।

অতএব বুঝা গেল শেয়ার মূল্যের উত্থান পতনের সাথে কোম্পানীর লাভ-লোকসানের সম্পর্ক থাকলেও সামঞ্জস্য থাকে না। অর্থাৎ শেয়ার মূল্যের উত্থান পতনে কোম্পানীর লাভ লোকসানের প্রভাব থাকলেও অধিকাংশ সময় বাজারের বিভিন্ন পরিস্থিতি এতটাই প্রভাব ফেলে যে, কোম্পানীর লাভ-লোকসানের কোন পাত্তাই সেক্ষেত্রে থাকে না। প্রশ্নোক্ত আলোচনায় এ বিষয়টিকেই এভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে 'বর্তমানে শেয়ারবাজারে শেয়ারসমূহ সংশ্লিষ্ট কোম্পানী থেকে ***প্রায় স্বতন্ত্র***"।

সুতরাং প্রশ্নোক্ত আলোচনার ব্যাপারে একথা বলার সুযোগ নেই যে, 'শেয়ার মূল্য বাড়া বা কমার ক্ষেত্রে কোম্পানীর মৌলিক ভিত্তি অর্থাৎ আর্থিক অবস্থাকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া হয়েছে"।

আপনি আপনার প্রশ্নে যে বক্তব্য তুলে ধরেছেন তাতে শুধু এতটুকু প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশে শেয়ার বাজারে ঐ সকল কোম্পানীর মূল্যই বেশি যেগুলো অধিক হারে মুনাফা দেয় এবং নেট এসেট ভ্যালু বেশি। আর ঐ সকল কোম্পানীর মূল্য কম যেগুলো মুনাফা কম দেয় এবং নেট এসেট ভ্যালু কম। কিন্তু একথা প্রমাণিত হয় না যে, শেয়ার বাজারে শেয়ার মূল্যের সাথে সেই মুনাফার হারের উল্লেখযোগ্য কোন সামঞ্জস্য আছে।

বাস্তবতা হল শেয়ার বাজারে শেয়ার মূল্যের কোম্পানী ঘোষিত মুনাফার হারের সাথে কোন তুলনা চলেনা এবং দুটোর গতি কখনো এক রকম হয় না। আমাদের মাসআলার ভিত্তি ছিল মূলত একথার উপরেই।

কয়েকটি উদাহরণ দ্বারা বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

এক. ২০১১ সালের কথা। তখন প্রতি ৬ মাস অন্তর কোম্পানীগুলোকে তাদের আর্থিক বিবরণী প্রকাশ করতে হত। সেখানে কোম্পানীর নেট এসেট ভ্যালু (প্রকৃত সম্পদ মূল্য), শেয়ার প্রতি আয় ইত্যাদি তথ্য থাকে। তখন গ্রামীনফোনের আর্থিক বিবরণীতে কর্তৃপক্ষ বলেছে যে, তাদের শেয়ার প্রতি আয় **১২**/- টাকা কয়েক পয়সা। অথচ শেয়ার বাজারে তখন গ্রামীনফোনের শেয়ার বিক্রি হচ্ছিল ৩০০/- টাকার অধিক মূল্যে। চিন্তা করুন, যেখানে কোম্পানী নিজেই তার শেয়ার প্রতি আয় ঘোষণা করছে **১২**/- টাকা কয়েক পয়সা, সেখানে **১০**/- টাকা ফেসভ্যালুর ঐ শেয়ার, মার্কেটে বিক্রি হচ্ছে হাজার পার্সেন্ট বেশি মূল্যে।

দুই. একবার সৌদী যুবরাজ রূপালী ব্যাংক কিনবে এই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে। তখন রূপালী ব্যাংকের শেয়ারের দাম বেড়ে যায়। তার **১০০** টাকার শেয়ার ৩০০০ টাকার বেশি দামে বিক্রি হয়েছে। অথচ ব্যাংকটি তখন কয়েক বছর যাবত ডিবিডেন্ট দিতে পারছিলনা। এজিএম করতে পারছিলনা। বছর বছর ধরে লোকসান গুনতে থাকা একটি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার তার ফেসভ্যালুর কয়েক হাজার পার্সেন্ট বেশি দামে লেনদেন হল। কিন্তু যুবরাজ যখন আর কিনল না তখন আবার আগের অবস্থায় ফিরে এলো। মাঝে প্রায় দু' বছর পর্যন্ত এই শেয়ারের লেনদেন হয়েছে অত্যন্ত চড়া দামে। (মাসিক আলকাউসার; এপ্রিল ২০১০)

এছাড়া শেয়ার বাজারের কিছু দৃশ্য লক্ষ্য করুন।

দৃশ্য ১ : ৮ ডিসেম্বর ২০১০, ভেন্যু: ডিএসই, বেলা **১০:৫৫** মিনিট: সূচক ৮৬০০ পয়েন্ট, **১১:৫৫** মিনিট: সূচক ৮৩০০পয়েন্ট, **১২:১৫** মিনিট: সূচক ৮০০০ পয়েন্ট, (এপর্যায়ে বিক্ষোভ ভাঙ্গচুর অতঃপর বিভিন্ন বৈঠক) এরপর দুপুর **১:৫৫** মিনিট: সূচক ৮৬০০ পয়েন্টের উর্ধ্বে।

দৃশ্য ২ : **১০** জানুয়ারী ২০**১১**, ডিএসই, বেলা **১১**টা: সূচক ৭**১**৫৫ এর বেশি, বেলা **১১:২০** মিনিট: সূচক ৬৭০০ পয়েন্টের কিছু কম, বেলা **১১:৫০** মিনিট : সূচক ৬৪৭৪ পয়েন্ট। অর্থাৎ ৫০ মিনিটের ব্যবধানে ৬৭৪ পয়েন্ট উধাও।

প্রথম দিন(৮ ডিসেম্বর) এর চিত্রটি দেখুন,প্রথম এক ঘন্টায় সূচকের ৩০০ পয়েন্ট পতন হয়েছে। এরপর ২০ মিনিটের মধ্যে আরো ৩০০ পয়েন্টের পতন হয়েছে। অর্থাৎ এক ঘন্টা বিশ মিনিটে ৬০০ পয়েন্টের পতন হয়েছে। অথচ এ সময় শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানী বড় ধরনের কোনো আর্থিক বিপর্যয়ে পড়েনি। দেশের বড় বড় কোম্পানীগুলো ভুমিকম্প, অগ্নিকান্ড বা কোনো আযাব গযবে পতিত হয়নি। তাহলে কেন এই দরপতন হল!

এবার দেখুন দ্বিতীয় দিনের চিত্র। বেলা **১:৫৫** মিনিটে সূচক অতিক্রম করে গেছে ৮৬০০ পয়েন্ট। মাঝের সময় **১** ঘন্টা ৪০ মিনিট। এ সময় এ দেশের শেয়ারবাজার সংশ্লিষ্ট কোনো কোম্পানী আলাদিনের চেরাগ হাতে পেয়েছে এমন কোনো খবর মিডিয়ায় প্রকাশিত হয়নি। তবে মাঝে মতিঝিলের রাস্তায় ব্যাপক বিক্ষোভ ও গাড়ি ভাঙ্গচুর হয়েছে এবং এসইসি তাদের কয়েকটি নীতি সংশোধন করেছে। আমরা সাধারণ নাগরিকেরা এতদিন শুনে এসেছি, দেশে হরতাল, বিক্ষোভ ও ভাঙ্গচুর হলে অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, শেয়ারবাজারের ক্ষেত্রে তো উল্টোটাই দেখা গেল। এখন বলুন, এই মহা বৃদ্ধি ও হ্রাস কেন ঘটল। (মাসিক আলকাউসার; ফেব্রুয়ারী ২০১১)

তাছাড়া নাজায়েয হওয়ার কারণ শুধু উল্লিখিত একটাই না বরং নাজায়েয হওয়ার উল্লেখযোগ্য আরেকটি কারণ হল, শেয়ার বাজারে যারা শেয়ার কেনাবেচা করে তারা এটাকে কোম্পানীর আনুপাতিক অংশের কেনাবেচা মনে করে না। বরং শুধুই সার্টিফিকেট বা শেয়ার সংখ্যা কেনাবেচা মনে করে। একারণেই দেখা যায় শেয়ার মূল্য যখন অস্বাভাবিক হারে কমে যায় তখন তারা আন্দোলন করে শেয়ার বাজার অথবা এস.ই.সির বিরুদ্ধে। অথচ যদি কোম্পানীর আনুপাতিক অংশের কেনাবেচাই হতো তাহলে উচিত ছিল কোম্পানীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করা। কিন্তু এমনটি কখনো করে না।

এছাড়া কিছু উলামায়ে কেরাম কয়েকটি শর্তের সাথে শেয়ার কেনাবেচাকে জায়েয বললেও অধিকাংশ উলামায়ে কেরাম তাদের সাথে এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেছেন। কিন্তু তারপরও যদি তাদের এ সকল শর্ত মেনে নিয়ে জায়েয বলা হয় তাহলে বাস্তবতা হল বর্তমানে শেয়ার বাজার থেকে শেয়ার কেনাবেচার ক্ষেত্রে ঐ সকল শর্তের উপর আমল করা হয় না। আর কেউ আমল করতে চাইলেও তার জন্য আমল করা সম্ভব নয়। ফলে বর্তমানে শেয়ার বাজারে শেয়ার ব্যবসা সর্বসম্মতভাবে নাজায়েয।

আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম-৫

মাওলানা আব্দুল মালেক

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হযরত দাউদ আ.

নবুওয়াত ও রাজত্ব প্রসঙ্গ

বনী ইসরাইলের পক্ষ হয়ে বাহাদুর প্রতিপক্ষ জালুতকে হত্যা করার মাধ্যমে হযরত দাউদ আ. বনী ইসরাইলদের কাছে প্রিয় ব্যক্তি হিসেবে পরিণত হন। এতদিন যাবত বনী ইসরাইলের মাঝে যিনি নবী হিসেবে প্রেরিত হতেন, বাদশাহ হতেন তিনি ভিন্ন অন্য কেউ। সে হিসেবে হযরত শামউইল আ. ছিলেন বনী ইসরাইলের নবী, আর তালুত ছিলেন তাদের বাদশাহ। জালুতকে হত্যা করার পর আল্লাহ তা'আলা একই সাথে দাউদ আ.কে নবুয়ত ও রাজত্ব দান করেন। সাথে সাথে তাকে বিচারকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার যোগ্যতা দান করেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর; [সূরা বাকারা-২৫১])

পবিত্র কুরআনের ভাষায়-

وشددنا ملكه واتينه الحكمة وفصل الخطاب

'আমি তার রাজত্বকে করেছিলাম সুদৃঢ় এবং তাকে দান করেছিলাম জ্ঞানবত্তা ও মীমাংসাকর বাগ্মীতা। (সূরা সোয়াদ-২০)

হযরত দাউদ আ. সম্ভাব্য খ্রিস্টপূর্ব ১০১০ অব্দে ফিলিস্তিনে বনী ইসরাইলের প্রতি নবী হিসেবে প্রেরিত হন।

দাউদ আ.এর মু'জিযা

দাউদ আ.এর মু'জিযা ছিল, কোনরূপ আগুনের স্পর্শ ছাড়াই লোহা তার হাতে মোমের ন্যায় নরম হয়ে যেতো। (সূরা সাবা- ১০) এবং কোন হাতুড়ি ইত্যাদি ছাড়াই কেবল নিজ হাতের স্পর্শে উক্ত লোহা দ্বারা লৌহবর্ম তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

আল্লাহ তা'আলা তার উপর যাবূর কিতাব অবতীর্ণ করেছিলেন এবং তাকে অত্যন্ত সুন্দর কণ্ঠের অধিকারী করেছিলেন। সুললিত কণ্ঠে তিনি যখন যাবূর পড়তেন তখন পাহাড় ও পাখিরাও মুগ্ধ হয়ে তার সাথে তাসবীহ পাঠে রত হতো! (সূরা সোয়াদ- ১৮)

মুসনাদে আহমাদের এক বর্ণনায়ও (হা.নং ৮৬৪৬) হযরত দাউদ আ.এর সুললিত কণ্ঠের প্রশংসাবাণী নবীজীর পাক যবানে উচ্চারিত হয়েছে। তিনি অত্যন্ত দ্রুত তিলাওয়াত করতে পারতেন। সহীহ বুখারীর এক বর্ণনায় (হা.নং ৩৪১৭) এসেছে, ঘোড়ার জিন বাঁধতে বলে তিনি যাবুর কিতাব তিলাওয়াত শুরু করতেন এবং জিন বাঁধা শেষ হওয়ার আগেই কিতাব শেষ করে ফেলতেন। জীবিকার জন্য তিনি নিজ কর্ম ব্যতীত অন্য কারো মাধ্যম গ্রহণ করতেন না।

দাউদ আ.এর ইবাদত

হযরত দাউদ আ.এর নফল ইবাদাতের ব্যাপারে সহীহ বুখারীর অপর এক বর্ণনায় (হা.নং ১১৩১) এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় নামায হল দাউদ আ.এর নামায এবং সর্বাধিক পছন্দনীয় রোযা হল দাউদ আ.এর রোযা। তিনি রাতের অর্ধাংশ ঘুমাতেন, এক তৃতীয়াংশ নামাযে কাটাতেন এবং (অবশিষ্ট) এক ষষ্ঠাংশে পুনরায় বিশ্রাম করতেন। তিনি একদিন রোযা রাখতেন এবং একদিন ইফতার করতেন।

হযরত দাউদ আ. ফিলিস্তিনের বাইতুল মুকাদ্দাসে ইন্তিকাল করেন। (তাফসীরে তবারী; [সূরা সোয়াদ- ১৭-২০], আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ২/১১, কিসাসুল আম্বিয়া; পৃষ্ঠা ৪০৫, কিসাসুল কুরআন ২/৪৭২, আতলাসু তারীখিল আম্বিয়া; পৃষ্ঠা ৫৪)

হযরত সুলাইমান আ.

নবুওয়াত প্রসঙ্গ

হযরত সুলাইমান আ. ছিলেন দাউদ আ.এর সন্তান। আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলাইমান আ.কে প্রখর ধী-শক্তি এবং মামলা-মোকদ্দমার নিষ্পত্তিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যতা দান করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে কারীমে (সূরা আম্বিয়া- ৭৮, ৭৯) আয়াতে এ মর্মে একটি ঘটনাও আল্লাহ তা'আলা বর্ণনা করেছেন।

তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৯৭০ অব্দে (সম্ভাব্য) ফিলিস্তিনে বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের প্রতি নবী হিসেবে প্রেরিত হন। কুরআনে কারীমের বর্ণনামতে (সূরা নামল- ১৬) হযরত দাউদ আ.এর ইন্তিকালের পরে রাজত্ব ও নবুওয়াতের ক্ষেত্রে তিনি পিতার উত্তরাধিকারী হন। সুলাইমান আ.এর দাওয়াতে ইয়ামানের সাবা অঞ্চলের রানী (ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে যার নাম ছিল বিলকিস) কর্তৃক প্রজাবৃন্দ সহকারে ঈমান গ্রহণ করার ঘটনাটি সূরা নামলে (আয়াত- ৪৪) বর্ণিত হয়েছে।

সুলাইমান আ.এর রাজত্ব

মুসনাদে আহমাদের (হা.নং ৬৬৪৪) এক বর্ণনায় এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, সুলাইমান আ. আল্লাহর কাছে তিনটি দু'আ করেছিলেন। আল্লাহ তা'আলা তাকে দু'টি দান করেছেন। আমি আশাবাদী যে, তৃতীয়টিও আল্লাহ তা'আলা তাকে দান করবেন।

প্রথমত চেয়েছেন আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অনুযায়ী বিচারকার্য সম্পাদনের প্রজ্ঞা; আল্লাহ তা'আলা তাকে তা দান করেছেন। দ্বিতীয়ত চেয়েছেন এমন বাদশাহী, যার অধিকারী তার পরে আর কেউ হবে না; আল্লাহ তা'আলা এটাও তাঁকে দান করেছেন। তৃতীয়ত চেয়েছেন বাইতুল মুকাদ্দাসে নামায পড়ার উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হবে আল্লাহ তা'আলা তাকে যেন সদ্য ভূমিষ্ঠ শিশুর মত নিষ্পাপ করে দেন! আমি আশাবাদী যে, আল্লাহ তা'আলা সুলাইমান আ.এর এই দু'আও কবুল করেছেন!

হযরত সুলাইমান আ.এর রাজত্ব নির্দিষ্ট কোন ভৌগলিক গণ্ডিতে কিংবা নির্দিষ্ট কোন জাতি-গোষ্ঠির উপরে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং আল্লাহ তা'আলা তাকে পুরা দুনিয়ার একচ্ছত্র রাজত্ব দান করেছিলেন এবং পশু-পাখি, জীব-জন্তু, মানব-দানব এমনকি বাতাসসহ সমস্ত মাখলুকের উপর তাকে রাজক্ষমতা প্রদান করেছিলেন। সুলাইমান আ.এর মত এমন ব্যাপক ও বিস্তৃত রাজক্ষমতা আল্লাহ তা'আলা আর কাউকে দান করেননি।

উপরোল্লিখিত হাদীসটি ছাড়াও পবিত্র কুরআনে কারীমে (সূরা নামল- ১৬) এবং সহীহ মুসলিমের (হা.নং ৫৪২) বর্ণনায়ও হযরত সুলাইমান আ.এর এমন রাজক্ষমতা প্রাপ্তির কথা উল্লেখ হয়েছে।

সুলাইমান আ.এর মু'জিযা

আল্লাহ তা'আলা হযরত সুলাইমান আ.কে অনেক মু'জিযা দান করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে কারীমে বিভিন্ন স্থানে তা বর্ণনা করেছেন। যেমন-

জিহাদের জন্য সংগৃহিত অতি উৎকৃষ্ট প্রজাতির ঘোড়া দেখতে গিয়ে একবার সুলাইমান আ. আসরের নামায পড়ার কথা ভুলে গেলেন। মনে পড়ামাত্র আফসোস করত উক্ত ঘোড়াগুলোকে তাঁর শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী তিনি আল্লাহর নামে কুরবানী করে দিলেন। কেননা নামায কাযা হওয়ার পেছনে ঘোড়াগুলোই ছিল কারণ। আল্লাহ তা'আলা সুলাইমান আ.এর এই কুরবানীর বদৌলতে বাহন হিসেবে বাতাসকে তার আজ্ঞাবহ করে দিলেন। বাতাসের সাহায্যে একমাসের সফর তিনি এক সকাল কিংবা এক বিকালে সম্পন্ন করতেন। (তাফসীরে ইবনে কাসীর [সূরা সোয়াদ- ৩১])

গলিত তামার এক 'খনি' আল্লাহ তা'আলা সুলাইমান আ.কে দান করেছিলেন। যার দ্বারা অতি সহজেই তিনি তৈজসপত্র তৈরি করতেন। (সূরা সাবা- ১২)

আল্লাহর হুকুমে জিনেরা তার বাধ্যগত ছিল। উঁচু উঁচু ইমারত, হাউজের মত বড় বড় পাত্র, ভূমিতে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত ডেগসহ সুলাইমান আ. যা চাইতেন তাই জিনেরা তাঁর জন্য বানিয়ে দিত। তার জন্য সাগরে ডুব দিয়ে মণি-মুক্তা সংগ্রহ করত। জিন জাতির মাধ্যমে তিনি বর্তমানে ফিলিস্তিনে অবস্থিত বাইতুল মুকাদ্দাস নির্মাণ করেন। যা কিছুকাল মুসলমানদেরও কিবলা ছিল। (সূরা সাবা- ১৩, ১৪, সূরা সোয়াদ- ৩৭, ৩৮)

আল্লাহ তা'আলা তাকে পশু-পাখিসহ সমস্ত মাখলুকের ভাষা বোঝার জ্ঞান দান করেছিলেন। 'সাবা' অঞ্চলের সম্রাজ্ঞীকে কেন্দ্র করে হুদহুদ পাখি আর সুলাইমান আ.এর কথোপকথন পবিত্র কুরআনে কারীমেও (সূরা নামল- ২০) বর্ণিত হয়েছে।

সুলাইমান আ.এর সৈন্যবাহিনীর পদতলে পিষ্ঠ হয়ে যেন পিপিলিকার দল ধ্বংস না হয়ে যায় এ জন্য একটি পিঁপড়া কর্তৃক তার স্বজাতিকে সতর্ক করা এবং তার সতর্কীকরণ বক্তব্য সুলাইমান আ.এর বুঝতে পারার ঘটনাটি পবিত্র কুরআনে কারীমে বিশেষভাবে (সূরা নামল- ১৮) বর্ণিত হয়েছে।

সুলাইমান আ.এর ইন্তিকালের ঘটনা

সুলাইমান আ. কর্তৃক বাইতুল মুকাদ্দাসের নির্মাণকাজে নিযুক্ত জিনেরা ছিল দুষ্ট প্রকৃতির। আশঙ্কা ছিল যে, সুলাইমান আ.এর জীবদ্দশায় নির্মাণকাজ সমাপ্ত না হলে তারা কাজ ছেড়ে চলে যাবে। কাজেই মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসলে সুলাইমান আ. কৌশলবশত লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। আল্লাহ তা'আলা এ অবস্থায় তাঁকে মৃত্যু দান করেন। তাঁর ইবাদতখানা কাঁচ নির্মিত হওয়ায় বাইরে থেকে জিনেরা তাঁকে দাঁড়ানো ভেবে নির্মাণ কাজ চালিয়ে গেল। কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল। ইতোমধ্যে আল্লাহ তা'আলা সুলাইমান আ.এর লাঠিতে উইপোকা লাগিয়ে দিলেন। ফলে একপর্যায়ে সেটি দুর্বল হয়ে ভেঙে গেলে সুলাইমান আ.এর দেহ মাটিতে পড়ে গেল। তখন জিনেরা আসল বিষয়টি উপলব্ধি করে আফসোস করতে লাগল যে, হায়! যদি গায়েব জানা থাকত তবে তাদের এতদিন পর্যন্ত নির্মাণকাজের কষ্ট পোহাতে হত না। পবিত্র কুরআনে কারীমে (সূরা সাবা- ১৪) আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

একটি ভ্রান্ত ধারণা

হযরত সুলাইমান আ.এর পশু-পাখিও, জীব-জন্তুর ভাষা বোঝাকে কেন্দ্র করে একটি ভ্রান্ত জনশ্রুতি রয়েছে যে, পশু-পাখি, জীব-জন্তু সুলাইমান আ.এর পূর্ব হতেই বনী আদমের মত কথা বলত। সুলাইমান আ. তাদের থেকে এ মর্মে প্রতিশ্রুতি নেন যে, তারা যেন তিনি ব্যতীত আর কারো সাথে কথা না বলে! যদ্দরুণ এখন আর কেউ তাদের ভাষা বুঝতে পারে না!!

এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন! কেননা, পশু-পাখি, জীবজন্তু কখনোই বনী আদমের মত কথা বলেছে বলে কুরআন-হাদীসের বক্তব্য কিংবা নির্ভরযোগ্য কোন ঐতিহাসিক বর্ণনাও নেই। আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. এ ভ্রান্ত ধারণাকে 'অজ্ঞতা' উল্লেখ করে (কিসাসুল আম্বিয়া; পৃষ্ঠা ৪১৪) বলেন,

فانه هزل لا يقوله الا الذين لا يعلمون

অর্থ : এটা ভিত্তিহীন বক্তব্য! কেবল অজ্ঞরাই তা বলতে পারে!

আরেকটি ভিত্তিহীন ঘটনা

সুলাইমান আ.এর ব্যাপারে একটি ঘটনা লোকমুখে প্রসিদ্ধ আছে যে, তিনি একবার আল্লাহর নিকট থেকে সকল মাখলূককে একদিন খাওয়ানোর অনুমতি নিয়ে কয়েক মাস যাবত রান্না করলেন। রান্নাকৃত খাবার সুবিস্তৃত যমীনে রাখা হল, যার ব্যপ্তি ছিল কয়েক মাসের পথ! তারপর এসব খাবার সমুদ্রের একটি মাছই খেয়ে শেষ করেও যখন অতৃপ্ত রয়ে গেল, তখন সে সুলাইমান আ.কে বলল, আমার রব প্রতিদিন আমাকে এর তিনগুণ খাবার দেন। একথা শুনে সুলাইমান আ. সিজদায় লুটিয়ে যান...!

এ ঘটনাটি একেবারেই ভিত্তিহীন এবং বানোয়াট। হাদীস, তাফসীর কিংবা ইতিহাসের কোনো নির্ভরযোগ্য গ্রন্থে এর কোনো ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। তাছাড়া একজন নবীর জন্য এমন উদ্ভট আবদার করা কীভাবে সম্ভব?! কাজেই এ জাতীয় ঘটনা বর্ণনা করা এবং বিশ্বাস করা থেকে বিরত থাকা আবশ্যক। (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ২/১৯, কিসাসুল আম্বিয়া; পৃষ্ঠা ৪১৩, কিসাসুল কুরআন ২/৫০০, আতলাসু তারীখিল আম্বিয়া; পৃষ্ঠা ৫৪)

হযরত উযাইর আ.

প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী উযায়ের আ. বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের নবী ছিলেন। বনী ইসরাইল সম্প্রদায় অজ্ঞতাবশত তাকে আল্লাহর পুত্র বলত। যার বর্ণনা পবিত্র কুরআনে কারীমে (সূরা তাওবা- ৩০) উল্লিখিত হয়েছে।

তারীখে ইবনে আসাকিরে উল্লিখিত (৪০/৩২৪) সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে সালাম রাযি.এর এক বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, তাওরাত কিতাব বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের সম্মুখে মুখস্ত শোনানোর কারণে অভিভূত হয়ে বনী ইসরাইল তাঁকে 'আল্লাহর পুত্র' হওয়ার মত ভ্রান্ত আকীদায় বিশ্বাসী হয়ে পড়ে।

উযায়ের আ.এর বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। তবে পবিত্র কুরআনে কারীমে (সূরা বাকারায়- ২৫৯) একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এক বুযুর্গ ব্যক্তি গাধায় চড়ে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া এক জনপদের পাশ দিয়ে গমনকালে বিস্ময়বশত মনে মনে বললেন, কী পদ্ধতিতে আল্লাহ তা'আলা এ জনপদকে আবাদ করবেন...! আল্লাহ তা'আলা তৎক্ষণাৎ তার কুদরতের কারিশমা প্রদর্শন করার নিমিত্তে তাকে একশত বছরের জন্য মৃত্যু দান করলেন। এরপর তাকে জীবিত করে তার সামনে তার মৃত গাধাকেও জীবন দান করলেন এবং এটাও প্রত্যক্ষ করালেন যে, এত দীর্ঘ সময়ের মধ্যে তার সঙ্গে থাকা খাবার সামান্যতম নষ্ট হয়নি!

হাফেয ইবনে কাসীর রহ. এ আয়াতের তাফসীরে (তাফসীরে ইবনে কাসীর [সূরা বাকারা- ২৫৯]) উল্লেখ করেন যে, প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া বসতিটি হল 'বাইতুল মুকাদ্দাস'। যা 'বুখতুনাস্সার' নামক এক বাদশাহ ধ্বংস করে দিয়েছিল। আর বুযুর্গ ব্যক্তিটি

কে ছিলেন? বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ। প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী তিনি ছিলেন হযরত উযাইর আ.। তবে কারো কারো মতে তিনি 'ইরমিয়া' বা 'উরমিয়া' নামক এক নবী ছিলেন।

আল্লামা ইবনে জারীর তবারী রহ. (তাফসীরে তবারী [সূরা বাকারা- ২৫৯]) দ্বিতীয় সম্ভাবনাটিকেই গ্রহণ করেছেন। (কিসাসুল আম্বিয়া; পৃষ্ঠা ৪৩৭, কিসাসুল কুরআন ২/৫৯৯)

হযরত ইলয়াস আ.

কুরআনে কারীমে (সূরা সাফ্‌ফাত- ১২৩) এ আল্লাহ তা'আলা হযরত ইলয়াস আ.এর নবুয়ত ও কওমের প্রতি দাওয়াতের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। এছাড়া কুরআনে কারীমে কিংবা হাদীসের নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনা সূত্রে ইলয়াস আ.এর ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বর্ণিত হয়নি। ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে খ্রিস্টপূর্ব ৮৭০ অব্দে বর্তমান লেবাননের অন্তর্গত বা'লাবাক্ক শহরে বা'ল (মূর্তিপূজক) ফাইনিকিয়ূন সম্প্রদায়ের প্রতি নবী হিসেবে প্রেরিত হন। অন্যান্য নবীদের মতো তিনি স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন। (আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ১/৩৮৬, মা'আরিফুল কুরআন [সূরা সাফ্‌ফাত- ১২৩], আতলাসু তারীখিল আম্বিয়া; পৃষ্ঠা ৫৪)

হযরত আল ইয়াসা' আ.

নির্ভরযোগ্য বর্ণনায় হযরত ইয়াসা' আ.এর ব্যাপারে বিশদ কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। পবিত্র কুরআনের (সূরা সোয়াদ- ৪৮) বর্ণনা মতে তিনি বনী ইসরাইলের নবী ছিলেন। (আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ২/৫)

হযরত ইউনুস আ.

নবুওয়াত প্রসঙ্গ

কুরআনে কারীমে উল্লিখিত রাসূলদের মধ্য হতে হযরত ইউনুস আ. অন্যতম। হযরত ইবনে আব্বাস রাযি.এর সূত্রে সহীহ বুখারীর এক বর্ণনায় (হা.নং ৩৩৯৫) এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى

অর্থ : কারো জন্য একথা বলা শোভনীয় নয় যে, 'আমি' ইউনুস ইবনে মাত্তা থেকে উত্তম।

হাফেয ইবনে হাজার রহ. (ফাতহুল বারী; হা.নং ৪৬০৩) এর ব্যাখ্যায় বলেন, নবীজী মূলত বিনয়বশত ইউনুস আ.কে নিজের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। অন্যথায় তিনি তো সকল নবীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ!

খ্রিস্টপূর্ব ৭৮০ অব্দে বর্তমান ইরাকের নিনওয়া অঞ্চলে আশূরিয়্যুন সম্প্রদায়ের প্রতি নবীরূপে প্রেরিত হন। যারা সংখ্যায় এক লক্ষের কিছু বেশি ছিল।

ইউনুস আ. মাছের পেটে...

পবিত্র কুরআনে কারীমে (সূরা ইউনুস- ৯৮, সূরা আম্বিয়া- ৮৭, ৮৮, সূরা সাফ্‌ফাত- ১৩৯-১৪৮) হযরত ইউনুস আ.এর এ ঘটনা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন।

দীর্ঘদিন দাওয়াতের পরও ঈমান না আনায় কওমের লোকদের তিনি তিনদিনের মধ্যে আযাবের ভয় দেখালেন এবং আল্লাহর আদেশের অপেক্ষা না করেই নিজে বসতি ত্যাগ করলেন। ইতোমধ্যে কওমের লোকেরা তওবা করে ঈমান আনয়ন করলে অত্যাসন্ন আযাব হটে গেল। অপরদিকে ইউনুস আ. সমুদ্র পার হওয়ার উদ্দেশ্যে যে কিশতীতে আরোহন করলেন, ঝড়ের কবলে পড়ে তা ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল। জাহাজের লোকেরা লটারী করল এ উদ্দেশ্য যে, আরোহীদের মধ্যে এমন কেউ আছে, যে তার মনীবের নির্দেশ ছাড়া চলে এসেছে! তাকে বের করে সমুদ্রে নিক্ষেপ করবে!

তিনবারের লটারীতে প্রত্যেকবারই ইউনুস আ.এর নাম উঠে আসল। সুপ্রসিদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ (তাফসীরে রুহুল মাআনী [সূরা আম্বিয়া- ৮৭]) এর বর্ণনা মতে ঘটনার এ পর্যায়ে এসে ইউনুস আ. বুঝতে পারলেন যে, বসতি ত্যাগ করার ব্যাপারে সরাসরি আসমানি নির্দেশের অপেক্ষা না করে চলে আসায় আল্লাহ তা'আলা অসন্তুষ্ট হয়েছেন। ফলে তিনি নিজেই নিজেকে সমুদ্রবক্ষে নিক্ষেপ করলেন।

আল্লাহর নির্দেশে বৃহদাকারের একটি মাছ তাকে গিলে ফেলল। তবে ইউনুস আ.কে হজম করে ফেলা কিংবা তার শরীরের কোন অংশের ক্ষতি করার অনুমতি তার ছিল না।

ইউনুস আ. মাছের পেটে কতদিন ছিলেন, এ বিষয়টি মতবিরোধপূর্ণ। হাফেয ইবনে কাসীর রহ. বলেন, (তাফসীরে ইবনে কাসীর [সূরা সফ্‌ফাত- ১৩৯]) কারো মতে তিন দিন, কারো মতে সাত দিন, কারো মতে চল্লিশ দিন, আবার কারো মতে এক দিবস ইউনুস আ. মাছের পেটে ছিলেন। আল্লাহই সর্বজ্ঞ। ইউনুস আ. তিন অন্ধকার তথা রাতের বেলা, সমুদ্রের গভীরে, মাছের পেটের মধ্য হতে আল্লাহর কাছে দু'আ করলেন,

لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

আল্লাহর নির্দেশে মাছ সমুদ্রতীরে ইউনুস আ.কে রেখে দিল। আল্লাহ তা'আলা তার উপর একটি লাউ গাছ জন্মিয়ে দিলেন। এ পরিস্থিতিতে লাউ গাছের বিশেষত্ব সম্পর্কে তাফসীরে ইবনে কাসীরে (সূরা সফ্‌ফাত- ১৩৯) উল্লেখ করা হয়েছে যে, লাউ গাছের পাতাসমূহ অত্যন্ত নরম, ঘন এবং ছায়াদার হয়ে থাকে। এ গাছের কাছে মশা-মাছি আসে না। এ গাছের ফল অর্থাৎ লাউ, তার নরম ছিলকা ও বিচি-সবই খাওয়া যায়। আর তা মস্তিষ্কের জন্য বেশ উপকারী! আর এ সবগুলো উপকারই হযরত ইউনুস আ.এর প্রয়োজন ছিল।

হযরত আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত অপর একটি বর্ণনা (তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম [সূরা সফ্‌ফাত- ১৩৯] দ্বারা জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা ইউনুস আ.এর জন্য একটি পাহাড়ী বকরী ব্যবস্থা করে দিলেন। যা প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা ইউনুস আ.কে দুধ পান করাতো। (তাফসীরে ইবনে কাসীর, কিসাসুল আম্বিয়া; পৃষ্ঠা ৩৬৯)

তাফসীরে ইবনে কাসীর (সূরা সফ্‌ফাত- ১৩৯) এর বর্ণনা অনুযায়ী এর কিছুদিন পর আল্লাহ তা'আলার নির্দেশে হযরত ইউনুস আ. তার কওমের বসতি নিনওয়া অঞ্চলে ফিরে যান। কওমের লোকেরা ইতোমধ্যেই তওবা করে ঈমান আনয়ন করেছিল। কাজেই তারা হযরত ইউনুস আ.এর আনীত দীনকে গ্রহণ করে নিল..। হযরত ইউনুস আ. নিনওয়া শহরেই ইন্তিকাল করেন। (তাফসীরে তবারী [সূরা আম্বিয়া- ৮৭], মুসনাদে বায্‌যার; হা.নং ৮২২৭, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ১/২৭৩, কিসাসুল আম্বিয়া; পৃষ্ঠা ২৪৩, কিসাসুল কুরআন ২/৫৬৯, আতলাসু তারীখিল আম্বিয়া; পৃষ্ঠা ৫৫)

হযরত যাকারিয়া আ.

বনী ইসরাইলের নবীগণের মধ্যে হযরত যাকারিয়া আ. অন্যতম। তিনি ফিলিস্তিনে নবী হিসেবে প্রেরিত হন।

সকল নবীরই এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তাঁরা আপন জীবিকার ব্যবস্থা নিজ হাতে করতেন। এ ব্যাপারে তাঁরা কারো দ্বারস্থ হতেন না। বরং একথা বলতেন,

ما اسئلكم عليه من اجر ان اجري الا علي رب العلمين

অর্থ : আমি এ কাজের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আমার প্রতিদান বিশ্বজগতের প্রতিপালক নিজ দায়িত্বে রেখেছেন। (সূরা শু'আরা- ১০৯)

হযরত যাকারিয়া আ.ও এই 'নববী বৈশিষ্ট্যের' ব্যতিক্রম ছিলেন না। সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় (হা.নং ১৬৯) এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

كان زكرياءنجارا

অর্থ : যাকারিয়া আ. কাঠের কাজ করতেন।

যাকারিয়া আ.এর দু'আ

যাকারিয়া আ.এর স্ত্রী ছিলেন মারইয়াম (যিনি হযরত ঈসা আ.এর মাতা ছিলেন)এর খালা। শিশু কন্যা মারইয়ামের পিতার অনুপস্থিতিতে খালু হিসেবে যাকারিয়া আ. তার দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। মারইয়াম আ.এর কারামত ছিল যে, সবসময় তার কাছে অ-মৌসুমী ফলের সম্ভার থাকতো! যাকারিয়া আ. যখন তা দেখতে পেলেন তখন 'যে আল্লাহ তা'আলা এক মৌসুমে অন্য মৌসুমের ফল দিতে পারেন তিনি বার্ধক্যেও সন্তান দিতে পারেন!' নিজের মাঝের সুপ্ত এ বিশ্বাসের দৃঢ়তা তাকে বনী ইসরাইলের পরবর্তী নবী হিসেবে সন্তান প্রাপ্তির দু'আ করতে উদ্বুদ্ধ করল। যাকারিয়া আ. নিজে নিঃসন্তান হওয়ার কারণে এ বিষয়ে বেশি দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন যে, বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের পরবর্তী নবী কে হবেন? কাজেই বনী ইসরাইলের পরবর্তী নবী হিসেবে তিনি একটি পুত্র সন্তানের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করলেন।

আল্লাহ তা'আলা তার দু'আ কবুল করলেন এবং হযরত যাকারিয়া আ.এর মু'জিযা স্বরূপ যখন তার বয়স ১২০ বছর এবং তার স্ত্রীর বয়স ৯৮ বছর, অপরদিকে তার স্ত্রী সন্তান জন্মদানে অক্ষম ছিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তার স্ত্রীকে সুস্থ করে দিয়ে তাদেরকে একটি পুত্র সন্তান দান করলেন। যিনি হলেন বনী ইসরাইলের পরবর্তী নবী ইয়াহইয়া আ.। (সূরা মারইয়াম- ৭, সূরা আলে ইমরান- ৩৭-৪১, সূরা আনআম- ৮৬, সূরা মারইয়াম- ২-১১, সূরা আম্বিয়া- ৮৯, ৯০, তাফসীরে ইবনে কাসীর [সূরা আলে ইমরান- ৪০], আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ২/৫৬, কিসাসুল কুরআন ২/৬১২, আতলাসু তারীখিল আম্বিয়া; পৃষ্ঠা ৫৫)

একটি ভিত্তিহীন ঘটনা...

হযরত যাকারিয়া আ.এর ইন্তিকালের ব্যাপারে একটি ঘটনা প্রসিদ্ধ রয়েছে যা কিছুটা এরূপ-

অবাধ্য সম্প্রদায় বনী ইসরাইল তাদের নবী যাকারিয়া আ.কে হত্যা করার নিমিত্তে ধাওয়া করলে তিনি একটি গাছের মধ্যে লুকিয়ে পড়েন। গাছ দ্বিখণ্ডিত হয়ে তাকে নিজের মাঝে আশ্রয় প্রদান করে। কিন্তু ইবলিস শয়তান হযরত যাকারিয়া আ.এর জামার একটি প্রান্ত গাছের বাইরে বের করে রাখে এবং বনী ইসরাইলকে দেখিয়ে দেয়। এরপর বনী ইসরাইল গাছসহ হযরত যাকারিয়া আ.কে করাত দ্বারা দ্বিখণ্ড করে ফেলে...!

একথা ঠিক যে, বনী ইসরাইল সম্প্রদায় তাদের অনেক নবীকে হত্যা করেছিল। কিন্তু যাকারিয়া আ. হত্যা সম্পর্কে প্রচলিত এ ঘটনা কোন গ্রহণযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত নয়। আল্লামা ইবনে কাসীর রহ. এ ঘটনা উল্লেখপূর্বক (আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া ২/৫৮) বলেন,

هذا سياق غريب جدا وحديث عجيب ورفعه منكر وفيه ما ينكر على كل حال.

অর্থ : এর বর্ণনাসূত্র অপ্রসিদ্ধ। এটি একটি আজব হাদীস। নবীজীর দিকে এই হাদীসের সম্বন্ধ করা অগ্রহণযোগ্য ও সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য।

হযরত ইয়াহইয়া আ.

নবুওয়াত প্রসঙ্গ

হযরত ইয়াহইয়া আ. হযরত যাকারিয়া আ.এর পুত্র এবং বনী ইসরাইলের নবী ছিলেন। ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে ২৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি ফিলিস্তিনে নবী হিসেবে প্রেরিত হন।

মুসনাদে আহমাদের (হা.নং ১৭১৭০) এক বর্ণনায় হযরত ইয়াহইয়া আ. কর্তৃক আল্লাহর নির্দেশে বনী ইসরাইলকে বাইতুল মুকাদ্দাসে সমবেত করে দাওয়াত প্রদান করার বিষয়টি বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ তা'আলা শৈশবেই তাকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং তাওরাত কিতাব ও শরীয়তের জ্ঞানের অধিকারী করেছিলেন। সাথে সাথে দান করেছিলেন ভালো কাজের রীতি-নীতি সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وآتيناه الحكم صبيا

অর্থ : আর আমি তাকে শৈশবেই জ্ঞানবত্তা দান করেছিলাম।

উল্লেখ্য, 'শৈশবেই জ্ঞানবত্তা' দানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কেউ কেউ মনে করে থাকেন যে, ইয়াহইয়া আ.কে শৈশবেই নবুয়ত দান করা হয়েছিল। এ ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়। হাফেয ইবনে কাসীর রহ. এখানে 'জ্ঞানবত্তা'র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, (তাফসীরে ইবনে কাসীর [সূরা মারইয়াম- ১২])

وآتيناه الحكم صبيا أي: الفهم والعلم والجد والعزم، والإقبال على الخير، والإكباب عليه، والاجتهاد فيه وهو صغير حدث [السن]

অর্থ : আয়াতে 'জ্ঞানবত্তা' দ্বারা (নবুয়ত উদ্দেশ্য নয়; বরং) উদ্দেশ্য হল, (সাধারণ) প্রজ্ঞা, জ্ঞান, সমঝদারি ও ভালো কাজের পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে গভীর উপলব্ধি, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁকে শৈশবেই দান করেছিলেন। মাওলানা হিফযুর রহমান সিওহারবী রহ. তার (কাসাসুল কুরআন ২/৬২২) গ্রন্থে 'জ্ঞানবত্তা' দ্বারা 'নবুয়ত' উদ্দেশ্য না হওয়ার কথা জোরালোভাবে উপস্থাপন করেছেন।

ইয়াহইয়া আ.এর পরহেযগারী

মুসনাদে বাযযার (হা.নং ২৩৫১)[১] হযরত আমর ইবনুল আস রাযি.এর সূত্রে এক বর্ণনায় এসেছে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইয়াহইয়া আ.এর পরহেযগারী সম্পর্কে বলেন,

ما هم بخطيئة

অর্থ : তিনি [ইয়াহইয়াহ আ.] কখনো কোন গোনাহের ইচ্ছাও করেননি।

ইন্তিকাল

ইয়াহইয়া আ. বনী ইসরাইল সম্পদায়ের মাঝে দাওয়াতী কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। কিন্তু অবাধ্য সম্প্রদায় বনী ইসরাইল অন্যান্য অনেক নবীর মত তাকেও শহীদ করে দেয়। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব রহ.এর মতে তিনি বর্তমান সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে শহীদ হন। (সূরা আলে ইমরান- ৩৯, সূরা আনআম- ৮৬, সূরা মারয়াম- ১২-১৫, সূরা আম্বিয়া- ৯০, আলবিদায়া ওয়াননিহায়া ২/৫০, কাসাসুল আম্বিয়া; পৃষ্ঠা ৪৪৮০, মু'জিযুত তারীখিল ইসলামী; পৃষ্ঠা ২৩, আতলাসু তারীখিল আম্বিয়া; পৃষ্ঠা ৫৫)

(চলবে ইনশা-আল্লাহ)

লেখক : শিক্ষক, জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা।

[১] মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২২৯৪

নভেম্বর-ডিসেম্বর ২০১৫ ইং সংখ্যায় এ কলামে আমার বড় মামার কাহিনী লিখেছিলাম। আমার মামার কাহিনী পড়ে আরেক ভাগ্নে তার মামার কাহিনী শোনাল। মূল কাহিনীতে ভিন্নতা থাকলেও আমার ও তার মামার পরিণতি প্রায় একই। ভাবলাম, তার মামাকেও এ কলামে স্থান দেয়া উচিত। ঘটনার সারসংক্ষেপ ভাগ্নের কাছ থেকেই শুনুন...

পানি নয়! মরীচিকা

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন, وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً... **অর্থ : এবং যারা কুফর অবলম্বন করেছে তাদের কার্যাবলী যেন মরুভূমির মরীচিকা, যাকে পিপাসার্ত লোক মনে করে পানি। অবশেষে যখন সে তার কাছে পৌঁছে তখন বুঝতে পারে, তা কিছুই নয়...। (সূরা নূর- ৩৯)**

দৃষ্টান্তটি মূলতঃ কাফিরদের জন্য। আফসোসের বিষয়! আজ অনেক মুসলমানও ক্ষণস্থায়ী জীবনে শান্তির আশায় শরীয়ত বিরোধী ও শরঈ দৃষ্টিতে অপছন্দনীয় পথ ও পন্থা অবলম্বন করে। অবশেষে তাদের আশা মরুভূমির মরীচিকা হয়ে প্রকাশ পায়। তখন হতাশা ছাড়া প্রাপ্তি আর কিছুই থাকে না। এ কলামে এমনই কিছু বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হবে। এসব চিত্রে স্পষ্ট হয়ে উঠবে আলোচ্য আয়াতের যথার্থতা। উদ্দেশ্য হল, বিবেকবানেরা যেন সময় থাকতে সতর্ক হয়। আল্লাহ তা'আলা তাওফীক দিন। আমীন॥

সুখী পরিবারের সুখ সমাচার-১৩

দুনিয়ার স্বর্গরাজ্যখ্যাত আমেরিকার প্রবাস জীবনের সনদ পেয়ে হয়তো ভেবেছিলেন স্বর্গসুখও তার কপালে চুম্বন এঁকে দেবে। কিন্তু জীবনের পড়ন্ত বেলায় প্রৌঢ়ত্বে এসে স্বর্গলোকের ভাবনাগুলো যে এমন মরীচিকা হয়ে ধরা দেবে, তা বোধ করি মামার কল্পনায়ও ছিল না।

পাঠক! ঘটনাটি আমার বড় মামার। যিনি বর্তমানে আমেরিকায় সপরিবারে বসবাসরত। প্রবাস জীবনে মামা অন্যান্য ব্যবসার পাশাপাশি সেখানকার একটি ফাইভস্টার হোটেলের ম্যানেজার ছিলেন। ঢাকার ধানমণ্ডিতে থাকা দু'টি বাড়ির পাশাপাশি আমেরিকাতেও নিজস্ব বাড়ি-গাড়ির অধিকারী হতে মামার তেমন বেগ পেতে হয়নি।

মামার প্রাথমিক পড়াশোনা শুরু হয় গ্রামে। সেখানেই জীবনের প্রথম অংশ কাটে। লেখাপড়ার একেকটি স্তর পার করে একপর্যায়ে উচ্চশিক্ষার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ছাত্রজীবনে খুব মেধাবী ছাত্র হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে প্রাইভেট পড়াতেন। এর সূত্র ধরে তাদের সঙ্গে ওঠাবসা। এক পর্যায়ে মামার মেধা ও বিচক্ষণতায় মুগ্ধ হয়ে তারা তাদের মেয়েকে মামার সঙ্গে বিয়ে দেন। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ির সহযোগিতায় স্টুডেন্ট ভিসায় লন্ডন, তারপর সেখান থেকে পাড়ি জমান আমেরিকায়। এর কিছুদিন পর স্ত্রী-সন্তানদেরকে সেখানে নিয়ে যান। এক ছেলে তিন মেয়ে নিয়ে প্রবাসেই শুরু হয় তার সংসার জীবন।

সন্তানদেরকে অনেক ডলার ব্যয় করে সেখানকার নামীদামি স্কুল-কলেজে ভর্তি করান। সঙ্গত কারণেই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির স্পর্শে বিলাসিতা ও বাঁধনহীন জীবনের হাওয়া বইতে থাকে তাদের জীবনের পরতে পরতে। মামার ব্যক্তিত্বে ভাবগাম্ভীর্য ও আভিজাত্যের ছাপ ছিল সুস্পষ্ট। কিন্তু বিত্তবৈভবের প্রাচুর্যে ক্রমশ আচরণ-উচ্চারণে রুক্ষতা প্রকাশ পেতে থাকে। এমনকি আমার নানীকেও দেখেছি, জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি মামার ধমক খেয়েছেন।

মনে পড়ে, একবার তিনি মামার কাছে একটি ব্যাপারে খুব কাকুতি মিনতি করে বাচ্চার মতো পিছনে পিছনে ঘুরছিলেন। কিন্তু মামা কোন ভ্রুক্ষেপ করছিলেন না, উল্টো ধমক দিয়ে যাচ্ছিলেন। এর কিছুদিন পরই নানীর ইন্তেকাল হয়ে যায়। আমার আম্মাকেও কখনো মামার সামনে নির্ভয়ে কথা বলতে দেখিনি।

আমার এক খালা জীবনের অন্তিম মুহূর্তে নিজ মেয়ের বাড়িতে ছিলেন। বিছানায় শুয়ে কাতরাতেন। ইতোমধ্যে মামা বাংলাদেশে আসলে কোন কাজে গ্রামের বাড়ি যান। কাজ শেষে যখন মামার গাড়ি ঢাকার উদ্দেশ্যে খালার বাড়ির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল, ঘটনাক্রমে ঐ মুহূর্তে খালার মেয়ে ফোন দিয়ে মামার সঙ্গে কথা বলেন এবং তার মায়ের অসুস্থতার কথা তুলে ধরেন। খালা বিছানা থেকে মামার আওয়াজ শুনে ওঠে বসেন এবং মামার সাথে কথা বলার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। দীর্ঘদিন কথা হয়নি। তাই হয়তো শেষবারের মত ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মামা শুনলেন না। অবহেলার সুরে 'পরে কথা বলব' বলে ফোন রেখে দেন। এর কয়েক মিনিট পরই খালা মারা যান।

খবর পেয়ে মামা খানিকটা লজ্জিত হন। তৎক্ষণাত গাড়ি ঘুরিয়ে খালার বাড়িতে যান। তাকে দাফন করে ফিরে আসেন।

মামার সামনে তার ভাইয়েরাও ভয়ে তটস্থ থাকতো। কখনো কথা বলতে গেলে তাদেরকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেন। খুব দাপটের সাথে কথা বলতেন এবং নিজের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে খুব গর্ব করতেন। মামা প্রায়ই অন্য মামাদের সাথে (যারা গ্রামে কৃষি কাজ করতো) গর্ব করে বলতেন, আমার সন্তানদেরকে আমি আমেরিকার অমুক নামীদামি স্কুল-কলেজে এতো এতো ডলার খরচ করে পড়াই, আর তোদের ছেলেরা তো গ্রামের...!

মামার স্বপ্নের শুরু তার একমাত্র ছেলেকে নিয়ে। ছেলে লেখাপড়া শেষ করে চাকুরী শুরু করে। প্রথম মাসের বেতন পেয়েই বাবার হাতে চেক তুলে দেয়। যোগ্য সন্তান বটে! গর্বে বুকটা ফুলে ওঠে মামার! অন্যের নিকট বলতেন, আমার ছেলে বেতন পাওয়ামাত্র আমার হাতে চেক তুলে দেয়। মামার স্বপ্নময়ূরী পেখম মেলতে শুরু করে...

ছেলেকে সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে বিয়ে করাবেন! ছেলের বউ ঘরে তুলবেন! ছেলের হাতে দেশ-বিদেশের বাড়ি-গাড়ি, সহায় সম্পত্তি বুঝিয়ে দিবেন! ছেলে পিতার সকল দায়িত্বভার নিজ কাঁধে তুলে নিবে...! সর্বোপরি ছেলেকে নিয়ে খুব সুখে-শান্তিতে-নিশ্চিন্তে জীবনের শেষ বেলা কাটাবেন!

ছেলের বিবাহের বয়স হলো। একদিন মামা ছেলের সামনে বিবাহের কথা ব্যক্ত করলেন। কিন্তু আমেরিকান কালচার যে ইতোমধ্যেই বাবা-অন্তঃপ্রাণ ছেলেকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে বহুদূর– স্বপ্নবিলাসী বাবার তা জানা ছিল না। ছেলে বলল, আমি করব বিবাহ! আমার কী আছে?

মামা আশ্চর্য হয়ে বললেন, কেন আমার এই বাড়ি-গাড়ি এবং ব্যাংক ব্যালেন্স সবই তো তোমার!! ছেলে বলে উঠল, এসব তো তোমার; আমার তো কিছুই না! আমার যেদিন বাড়ি-গাড়ি হবে সেদিনই বিবাহ করব। মামা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ছেলেকে নিয়ে দেখা স্বপ্নগুলো ধূসর হতে লাগল। তবু ছেলের মুখে তাকিয়ে সব ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করলেন। ভাবলেন, ছেলের নিজস্ব বাড়ি-গাড়ি হওয়া তো আমারই গর্বের কথা। আমি তো এখনো তার বাবা। সে হিসেবে দেখে-শুনে পছন্দমত বিবাহ করাব।

ছেলের বাড়ি-গাড়ি হল। কিন্তু কোথায় বাবার স্বপ্ন! আর কোথায়ই বা তার পছন্দমতো বিবাহ! এরই মধ্যে একদিন পুত্রধনটি তার এক গার্লফ্রেন্ডকে নিয়ে বাসায় উঠল। আমেরিকান কালচারে বেড়ে ওঠা খ্রিস্টান মেয়ে। দীন-ধর্ম কিছুই বোঝে না এবং স্বামী ছাড়া শ্বশুর-শাশুড়ী কাউকে চেনে না, চেনার প্রয়োজনও মনে করে না। ক্রমশ ছেলেও সে কালচারে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। বাবাকে কোন মূল্যায়ন করে না। এখন প্রবাস জীবনে নিজ ঘরে মামা হলেন পরবাসী। অসহায়ের মত চেয়ে দেখা আর আক্ষেপ করা ছাড়া তার কিছুই করার ছিল না। ধীরে ধীরে পিতা-পুত্রের সাক্ষাতও কমে যেতে লাগল।

এদিকে তিন মেয়ের মধ্যে বড় মেয়েকে দেখেশুনে মোটামুটি ভালো জায়গায় বিয়ে দিয়েছিলেন। বাংলাদেশী এক ডাক্তার ছেলের কাছে। শেষ বয়সে এই জামাই ছিল দেখাশোনার একমাত্র উপায়। তাই আপন ছেলে পর হয়ে যাওয়ার পর এই জামাই-ই হলো মামার একমাত্র ভরসাস্থল। মামা নিজ সহায়-সম্পত্তি দেখাশোনা ইত্যাদির দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত করার কথা ভাবতে শুরু করলেন। জামাইটিও মোটামুটি মামার দেখাশোনা করতো।

একদিন জামাই মিয়া নিজেই গাড়ি ড্রাইভ করে সপরিবারে মামার বাসায় বেড়াতে আসেন। ফেরার সময় জামাই আগে ভাগেই বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠেন। ৫/১০ মিনিট পর ছেলে-মেয়েকে নিয়ে তার স্ত্রী গাড়ির কাছে পৌঁছে দেখে, স্বামী ড্রাইভিং সিটে শুয়ে আছে। ভাবল, হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছেন। কিন্ত অনেকভাবে চেষ্টার পরও যখন জাগ্রত হলেন না তখন সবার মাঝে শঙ্কা ছড়িয়ে পড়ল। দ্রুত হাসপাতালে নেয়া হল। জানা গেল, ব্রেইন স্ট্রোকের শিকার। একদিন একরাত লাইফসাপোর্টে রাখা হল। কিন্তু তার সেই ঘুম আর ভাঙল না। সেই সাথে মামার শেষ আশাটুকুও নিভে গেল। মামা ছিলেন হার্টের রোগী। বার্ধক্যজনিত নানা রোগে আক্রান্ত। এ দুর্ঘটনায় একেবারেই মুষড়ে পড়েন।

এদিকে ভাইয়ের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে মেঝো মেয়েও কাউকে বলা-কওয়া ছাড়াই এক পাকিস্তানী ছেলের সঙ্গে পালিয়ে যায়। বাকি রইল ছোটো মেয়ে। দুই ছেলেমেয়ের অন্তর্ধান ও জামাইয়ের তিরোধানের পর এই মেয়েটিই মামার ভাবনার কেন্দ্রে পরিণত হয়। এখন মেয়েই তার একমাত্র সম্বল। তার জন্য একজন উপযুক্ত ছেলে খুঁজতে থাকেন, যে কিনা মামার স্থলাভিষিক্ত হবে এবং বার্ধক্যের জীবনে তার আস্থার পাত্র হবে। এজন্য তিনি দেশ-বিদেশের বহু জায়গা চষে বেড়িয়েছেন। কিন্তু মেয়ের মনপছন্দ ছেলের সুলুক-সন্ধান পাননি। একপর্যায়ে মেয়ের প্রত্যাশিত মানের ছেলে যোগাড় করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়াল। মেয়ের প্রথম শর্ত হলো ছেলে দেখতে-শুনতে-চলনে-বলনে স্মার্ট হতে হবে। দ্বিতীয়ত মেয়ের সাথে ইংরেজিতে খোলি কথা বলে খুশি করতে হবে। অভিজাত বংশ ও উন্নত শহরের বাসিন্দা হতে হবে। এক্ষেত্রে মেয়ে নিজেই ইন্টারভিউ নিবে। বহু ছেলেই মামার নামধামের কারণে অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু তার ইন্টারভিউতে সবাই ফেল। আর মেয়ে উপযুক্ত পাত্রের অভাবে বিবাহ ছাড়াই রয়ে গেল।

এ নিয়ে মামার নতুন করে দুশ্চিন্তা যোগ হয়। একপর্যায়ে মামা আমাকে অনুরোধ করেন কোন কবিরাজের কাছে যাওয়ার জন্য, যেন সহজে বিবাহের কোন ব্যবস্থা হয়ে যায়। মামার অনুরোধ রক্ষার্থে আমি কবিরাজের শরণাপন্ন হই এবং কবিরাজের দেয়া তদবির একটি চিঠিসহ পাঠাই। চিঠিতে তাকে কিছুটা সান্ত্বনা ও আসল শান্তির পথে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছিলাম।

ছোট মেয়ে এখন একটা অফিসে চাকুরী করে। বয়স ত্রিশ ছাড়িয়েছে। সারাদিন অফিসেই সময় কাটে। মামা-মামী দু'জনই বার্ধক্যজনিত রোগে আক্রান্ত। সারাদিন বাসায় অবসর জীবন যাপন করেন। মামার বয়স প্রায় আশির কোঠায়। প্রবাস জীবনে নিঃসঙ্গ এ অবসর যাপনে সেবা-যত্নের জন্য তার পাশে এখন কেউ নেই। নিজেরাই রান্না-বান্না করে খান। কখনো অসুস্থ হয়ে পড়লে পার্শ্ববর্তী পরিচিত কেউ এসে রান্না করে দেয়। এই দুর্দশা দেখে তার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় বলেছিল, আপনি বাংলাদেশে চলে আসেন। ধানমণ্ডিতে যেহেতু আপনার নিজস্ব বাড়ি আছে, ইচ্ছা করলে সেখানেও থাকতে পারেন। অথবা গুলশানে আপনার পছন্দমত বিলাসবহুল ফ্ল্যাট, গাড়ি এবং সেবা-যত্নের জন্য পর্যাপ্ত খাদেম ও আরাম-আয়েশের যাবতীয় ব্যবস্থা করা যাবে।

কিন্তু স্বপ্নাচ্ছন্নতার ঘোর কাটলেও উন্নত জীবন যাপনে অভ্যস্ত বিলাসী মানসিকতা তার অবচেতন মনকে জাগতে দিল না। মামা তার প্রস্তাব এ বলে ফিরিয়ে দিলেন যে, আমাদের দু'জনের কয়েক দিন পর পর হাসপাতালে যেতে হয়, চেকআপ করাতে হয়। বাংলাদেশে এরকম হাসপাতাল কোথায়...!

স্বপ্নভঙ্গের একরাশ যাতনা নিয়ে মামা এখন নিঃসঙ্গ। জীবনের শেষবেলায় উপনীত। তার জীবনাকাশে নেই কোনো আলোর ছোঁয়া। নেই কোন সুশীতল ছায়া। আজ তার কষ্টগুলো শোনারও কেউ নেই। স্বর্গরাজ্যের প্রবাসজীবন তার জীবনমানে উন্নতি এনে দিলেও স্বর্গসুখের ধ্রুবতারাটি তার অধরাই রয়ে গেছে। চার সন্তানের পিতৃত্বও ঘোচাতে পারেনি তার অন্তহীন একাকিত্ব...!

কারো সঙ্গে কথা বলতে গেলে এখন স্বপ্নভঙ্গের কষ্টগুলো কান্নার লাভাস্রোত হয়ে বেরিয়ে আসে। হয়তো এ কান্নাস্রোতে মিশে থাকে অনুতাপেরও দু' ফোঁটা আঁখিজল।

দু'আ করি, তার জীবনের এ দুঃসহ বেদনাভার লাঘব হোক। পরপারের ডাক আসার আগেই বোধোদয় ঘটুক। আমীন।

পাঠক! নিজ মুসলিম দেশে অবস্থান করে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবনে দীন-ধর্ম পালনের বর্তমান আনুকূল্য ও সীমিত স্বাধীনতাটুকুও বর্তমান যামানায় মহা গনীমত। কোনরূপ অপারগতা কিংবা দীনী উদ্দেশ্য ছাড়া শুধুই পার্থিব জীবনের রঙীন স্বপ্নের হাতছানিতে এ গনীমতকে তুচ্ছজ্ঞান করে যারা–দীনের বিচারে চরম প্রতিকূল–কাফের মুল্লুকে স্বর্গনিবাস গড়ে তুলেছেন, তাদের প্রায় সকলের জীবনেই এরকম যন্ত্রণা কমবেশি বিদ্যমান। খোঁজ নিয়ে দেখুন, সহমত হবেন ইনশা-আল্লাহ!

আবূ তামীম

গ্রন্থ পরিচিতি

কিতাবুল ঈমান

মাওলানা আব্দুর রায্যাক যশোরী

কিতাবুল ঈমান

লেখক : মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.

মুমিন বান্দার সবচেয়ে মূল্যবান ও সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হল ঈমান। হাদীসে এসেছে, যে কেউ আল্লাহর দরবারে শুধু ঈমানী দৌলত নিয়ে হাজির হবে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কমপক্ষে এই দুনিয়ার ন্যায় ১১টি জান্নাত দান করবেন। (তিরমিযী হা.নং ৩১৯৮)

তবে ঈমানী দৌলত হিফাযত করে তা নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাজির হওয়া বড় কঠিন। কারণ, শয়তান সর্বদাই আমাদের ঈমান ছিনিয়ে নিতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। সহীহ মুসলিমের এক হাদীসে এসেছে, একব্যক্তি ঈমান এনে এই পরিমাণ ভালো কাজ করেছে যে, জান্নাতে প্রবেশ করতে তার মাত্র এক কদম বাকী; এ সময় হঠাৎ সে এমন কাজ করে বসবে বা এমন কথা বলে ফেলবে, যার ফলে সে ঈমানহারা হয়ে জাহান্নামে চলে যাবে। আরেক ব্যক্তি সারাজীবন এত নাফরমানী করেছে যে, জাহান্নামে যেতে তার মাত্র এক কদম বাকী; এ সময় তার তওবা নসীব হবে, ফলে সে ঈমান এনে জান্নাতবাসী হয়ে যাবে। (সহীহ মুসলিম হা.নং ২৬৪৩)

তাই প্রতিটি মুমিনের কর্তব্য হল, ঈমানের হাকীকত জানার পাশাপাশি ঈমান বিনষ্টকারী ও ঈমান বিধ্বংসী আকীদা বিশ্বাস, কথা-বার্তা, কাজ-কর্ম সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়া। নতুবা সে যে কোন সময় নিজের অজান্তেই ঈমানহারা হয়ে যেতে পারে। উম্মতের এই জরুরত ও প্রয়োজনকে সামনে রেখে যুগে যুগে বিদগ্ধ উলামায়ে কেরাম ঈমান ও সহীহ আকীদা-বিশ্বাস সম্পর্কে বিভিন্ন ভাষায় রচনা করেছেন শত শত মূল্যবান গ্রন্থ। এ বিষয়ে আরবী ভাষায় স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন ইমাম কাসেম ইবনে সাল্লাম (২২৪হি.), ইবনে আবী শাইবা (২৩৫হি.), আবূ আব্দুল্লাহ আলআদনী (২৪৩হি.), ইমাম ত্বহাবী (৩২১হি.), আবূ মানসূর আলমাতুরিদী (৩৩৩হি.), ইবনে মানদাহ (৩৯৫হি.), আবূ বকর আলবাইহাকী (৪৫৮হি.), ইবনে তাইমিয়া প্রমুখ ইমামগণ।

উর্দূ ভাষায়ও এ বিষয়ে রচিত হয়েছে বহু মূল্যবান গ্রন্থ। তার মধ্যে মুজাদ্দিদে মিল্লাত আশরাফ আলী থানভী রহ.এর তা'লীমুদ্দীন, ফুরূউল ঈমান; শাহ শহীদ ঈসমাইল রহ.এর তাকবিয়াতুল ঈমান; মানযূর নোমানী রহ. কৃত দীন ও শরীয়ত, সাইয়িদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.এর দস্তুরে হায়াত অন্যতম।

তবে এ বিষয়ে বাংলা ভাষায় রচিত স্বতন্ত্র গ্রন্থের সংখ্যা একেবারেই কম। তন্মধ্যে অন্যতম ও অপূর্ব কিতাব হল 'কিতাবুল ঈমান'। লিখেছেন হাজারো উলামা-তলাবার একান্ত মুরব্বী ও প্রাণের স্পন্দন, দেশ ও জাতির দূরদর্শী রাহবার, বাংলাদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দীনী প্রতিষ্ঠান জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার প্রধান মুফতী ও শাইখুল হাদীস, শাহ আবরারুল হক রহ.এর অন্যতম খলীফা হযরতুল আল্লাম মুফতী মনসূরুল হক দা.বা.।

গ্রন্থটির বিষয়-বিন্যাস

১৭৬ পৃষ্ঠার মাঝারী কলেবরের এই মহামূল্যবান কিতাবটি লেখক ৫টি অধ্যায়ে সাজিয়েছেন-

অধ্যায় এক : সহীহ ঈমানের কষ্টিপাথর

অধ্যায় দুই : ঈমানের সাতাত্তর শাখা

অধ্যায় তিন : ইসলামের নামে ভ্রান্ত আকীদা

অধ্যায় চার : কুফর শিরক ও গুনাহে কবীরা

অধ্যায় পাঁচ : ইসলামের দৃষ্টিতে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ

বৈশিষ্ট্যাবলী

গ্রন্থটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, ঈমান ও ঈমানসংশ্লিষ্ট জটিল ও কঠিন বিষয়গুলোকে লেখক এতো সহজ ও সাবলীলভাবে পেশ করেছেন যে, সর্বস্তরের পাঠক তা হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম। হযরতকে যারা জানেন, তারা একথা ভালো করেই জানেন যে, বয়ানের মজলিসে, দরসের মসনদে, কিংবা কিতাবের পাতায় তিনি জটিল থেকে জটিলতর বিষয়াদিকেও এত সহজ, সাবলীল ও বোধগম্যভাবে পেশ করেন যে, সবাই অনায়াসে বুঝে যায়।

মুহতারাম লেখক সহীহ ঈমানের কষ্টিপাথর শিরোনামের অধীনে আল্লাহ তা'আলার উপর ঈমান, ফেরেশতাগণের উপর ঈমান, আল্লাহর প্রেরিত কিতাবমূহের প্রতি ঈমান, নবী ও রাসূলগণের প্রতি ঈমান, কিয়ামত দিবসের প্রতি ঈমান, তাকদীরের প্রতি ঈমান, মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার উপর ঈমান ইত্যাদি মৌলিক বিষয়গুলোর এত সুন্দর ও অপূর্ব ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন, যা পাঠককে অবশ্যই বিস্মিত করবে। তিনি এ অধ্যায়ে আরো কিছু গুরুত্বপূর্ণ আকীদার বিষয়ও উল্লেখ করেছেন। যেমন আল্লাহর দীদার, আরশ কুরসী, ইমাম মাহদী, হযরত ঈসা আ.এর দুনিয়ায় অবতরণ, দাজ্জাল, ইয়াজুয-মাজুয, দাব্বাতুল আর্‌দ, দু'আর মাঝে ওসীলা গ্রহণ, কারামত, কাশফ, ইলহাম, ইসালে সওয়াব, মাজার, ওলী, আবদাল, গাউস, কুতুব, রাশি নক্ষত্রের প্রভাব, রোগ সংক্রমণ, হস্তরেখা বিচার, নযর ও বাতাস লাগা, কুলক্ষণ ও সুলক্ষণ, তাবিয ও ঝাড়ফুঁক, ফাতেহা ইয়াযদহম ও আখেরী চাহার শোম্বা ইত্যাদি আকীদা সংক্রান্ত জটিল বিষয়গুলোকে সংক্ষেপে এত সহজ ও বোধগম্যভাবে তুলে ধরেছেন যে সবাই বুঝতে সক্ষম।

লেখক এই গ্রন্থে ঈমানের ৭৭টি শাখা সুবিন্যস্ত আকারে সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যাসহ খুব চমৎকারভাবে পেশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, ঈমানের ৭৭টি শাখার ৩০টি দিলের সাথে সম্পৃক্ত, ৭টি যবানের সাথে সম্পৃক্ত আর ৪০টি বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত...।

মুহতারাম লেখক এই কিতাবে সমাজে বিদ্যমান প্রায় ৪০টি ভ্রান্ত আকীদার স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। কুরআন-হাদীসের আলোকে দেখিয়েছেন যে, এর প্রতিটিই ঈমান বিধ্বংসী এবং ঈমানের সাথে সুস্পষ্ট সাংঘর্ষিক। যেগুলোর কিছু আল্লাহর ব্যাপারে, কিছু ফেরেশতাদের ব্যাপারে, কিছু আসমানী কিতাবসমূহের ব্যাপারে, কিছু নবী ও রাসূলগণের ব্যাপারে, কিছু কিয়ামত দিবসের ব্যাপারে, কিছু তাকদীরের ব্যাপারে আর কিছু সাহাবায়ে কেরাম ও আলেম-উলামার ব্যাপারে।

এই ভ্রান্ত আকীদাগুলো এতো মারাত্মক ও ভয়াবহ, যার কোন একটি আকীদাও কেউ পোষণ করলে তার ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা প্রবল।

আলোচ্য কিতাবে লেখক দা.বা. অত্যন্ত সতর্কতা ও বিচক্ষণতার সাথে শিরক, বিদআত, জাহেলী রুসূম ও

(২৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

জানাযার পূর্বে সম্মিলিত দু'আর বিধান

মাওলানা আবূ যর আহমাদ

প্রশ্ন : আমরা জানি, জানাযার নামাযের পর দাফনের পূর্বে দু'আ-মুনাজাত করা শরীয়ত সম্মত নয়। দু-একদিন আগে আমার হাতে একটি লিফলেট এসেছে, যাতে উক্ত মুনাজাত বৈধ হওয়ার পক্ষে কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করতে চেষ্টা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে আমার জানার বিষয় হল, উক্ত মুনাজাত বৈধ হওয়ার ক্ষেত্রে তাদের পেশকৃত দলীল-প্রমাণ সঠিক কিনা? না হয়ে থাকলে কুরআন-হাদীস দ্বারা এগুলোর খণ্ডন করলে উপকৃত হব।

সমাধান : জানাযার নামায পড়াই মাইয়িতের গুনাহ মাফ হওয়া ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য মুসলমানদের পক্ষ থেকে আল্লাহ তা'আলার নিকট সর্বোৎকৃষ্ট সম্মিলিত দু'আ; যা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত। জানাযার নামাযে তৃতীয় তাকবীরের পর যে দু'আ পড়া হয় তা এত ব্যাপক ও উপকারী দু'আ যা আমরা কখনো কল্পনা করেও শেষ করতে পারবো না। এরপরও জানাযার নামায শেষে দাফনের পূর্বে দু'আ করতে চাইলে ব্যক্তিগতভাবে দু'আ করতে নিষেধ নেই। কিন্তু জানাযার নামায শেষ করে আবার সম্মিলিতভাবে দু'আর কথা কুরআন-হাদীসের কোথাও উল্লেখ নেই।

এতদসত্ত্বেও জানাযার নামাযের পর সকলে মিলে লাশ সামনে নিয়ে আবার দু'আ করার অর্থ হল, শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত নিয়মের উপর সন্তুষ্ট না হয়ে নিজেরা একটা নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার করে নেয়া, যা নিন্দনীয় ও বিদআতের অন্তর্ভুক্ত।

আর লিফলেটে জানাযার পর সম্মিলিত দু'আ করার পক্ষে যে সমস্ত দলীল পেশ করা হয়েছে তার কোনটির দ্বারা জানাযার পর সম্মিলিত দু'আ করা প্রমাণিত হয় না এবং এর কোথাও জানাযার পর দাফনের পূর্বে সম্মিলিত দু'আ করার কথা উল্লেখ নেই।

এখানে প্রথমে কুরআনের দু'টি আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে, যে আয়াতদ্বয়ের সাথে জানাযার নামাযের পর সম্মিলিত দু'আ করা বা না করার সামান্যতম সম্পর্ক নেই। প্রথম আয়াতে সাধারণভাবে দু'আ করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে; কোন সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি। অনুরূপ দ্বিতীয় আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন রেওয়ায়েতে নামাযের কথা বললেও জানাযার নামাযের কথা কোন মুহাদ্দিস বলেননি। এ সকল আয়াত ও হাদীস দ্বারা জানাযার পর সম্মিলিত দু'আ প্রমাণিত হলে সাহাবায়ে কেরাম ও আইম্মায়ে মুজতাহিদীন থেকে সম্মিলিত দু'আর কথা বর্ণিত থাকত। অথচ তারা কেউ সম্মিলিত দু'আ করেছেন বা করতে বলেছেন এমন কোন প্রমাণ কোথাও নেই। সংযুক্ত লিফলেটেও এমন কোন প্রমাণ উল্লেখ নেই।

লিফলেটে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করে নিজের তরফ থেকে সম্মিলিত দু'আ প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে, যা সম্পূর্ণ ব্যর্থ চেষ্টা। কারণ কুরআন-হাদীস আজকে নাযিল হয়নি। আর জানাযার নামাযও নতুন কিছু নয়। সম্মিলিত দু'আ প্রমাণিত থাকলে আমাদের কারো ইজতিহাদ করার প্রয়োজন থাকত না। নিম্নে জানাযার পর সম্মিলিত দু'আ সম্পর্কে পূর্বকার উলামা ও ফুকাহাদের স্পষ্ট বক্তব্য তুলে ধরা হল, যাতে পরিস্কার হয়ে যাবে যে, লিফলেট প্রচারকগণ হাদীসের ব্যাখ্যায় ও ফিকহী কিতাবের রবাতে চরম জালিয়াতির আশ্রয় নিয়েছেন।

প্রথম হাদীস

লিফলেটে দলীলস্বরূপ যে হাদীস পেশ করা হয়েছে তার প্রথমটাতে دبر الصلوات المكتوبات এর মধ্যে জানাযার নামাযকেও শামিল করেছে, যা পূর্বের কেউ করেননি।

দ্বিতীয় হাদীস

إذ صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء এর ভুল অনুবাদ করা হয়েছে। এর সঠিক অনুবাদ হল, যখন তোমরা জানাযার নামায পড়বে, তখন তাঁর (মাইয়িতের) জন্য একনিষ্টভাবে দু'আ কর। অর্থাৎ জানাযার নামাযের মধ্যে যে দু'আ করা হয় তা একনিষ্টভাবে শুধু মাইয়িতের জন্যই করবে। এই অর্থ নয় যে, নামাযের পর আলাদা করে তার জন্য দু'আ করবে।

আর এখানে বলা হয়েছে, 'উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত হাদীসে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (ف) 'ফা' অক্ষরটি ব্যবহার করে জানাযা নামাযের সালাম ফিরানোর পর পরই মৃত ব্যক্তির জন্য খাস করে (সংক্ষিপ্ত) দু'আ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। (কুদূরী)' এখানে একটা জালিয়াতি করা হয়েছে, নিজের মনগড়া ব্যাখ্যাকে কুদূরীর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অথচ কুদূরীর কোথাও এ কথার উল্লেখ নেই। বরং এর বিপরীতে মুহাম্মাদ ইবনে সালেহ উসাইমিন এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود [الشَّرْحُ]هذا الحديث فيما يدعى به في الصلاة على الميت....أما حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعوتم للميت فأخلصوا له الدعاء بالمعنى أنك تدعو بحضور قلب وإلحاح على الله لأخيك الميت لأنه محتاج لك.

অর্থাৎ ...এই হাদীসটি জানাযার নামাযের মধ্যে মৃত ব্যক্তির জন্য যে দু'আ করা হয় সে সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। (শরহু রিয়াযিস সালিহীন ৪/৫৪৪)

তৃতীয় হাদীস

ثم كبر عليها أربعا، ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع في الجنائز هكذا

এখানেও লিফলেটওয়ালা বোঝাতে চেয়েছেন যে, হযরত ইবনে আবী আওফা (তার মেয়ের জানাযা পড়াচ্ছিলেন) প্রথমে চার তাকবীর দেন। অতঃপর দু'দিকে সালাম ফিরিয়ে জানাযার নামায শেষ করেন। এরপর তিনি দুই তাকবীরের মধ্যবর্তী সময় পরিমাণ দাঁড়িয়ে তার মেয়ের জন্য সম্মিলিতভাবে দু'আ করেন। অথচ পূর্ববর্তী আলেমগণের ব্যাখ্যা হল, এ দু'আ ছিল চার তাকবীরের পর সালাম ফেরানোর পূর্বে দু'আ করা সংক্রান্ত এবং এভাবে দু'আ জানাযার নামাযেরই

অংশ। জানাযার পরে নয়। যেমনটি আরো স্পষ্ট করে অপর এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে,

وفي التلخيص ورواه أبو بكر الشافعي في الغيلانيات وزادثم سلم على يمينه وشماله ثم قال لا أزيد على ما رأيت رسول الله يصنع وفي رواية البيهقي في سننه الكبرى من طريق إبراهيم بن مسلم الهجري حدثنا عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى على جنازة ابنته فكبر أربعا حتى ظننت أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله فلما انصرف قلنا له ما هذا فقال إني لا أزيد على ما رأيت رسول الله يصنع وهكذا كان يصنع رسول الله. (وذكر قبيل سطرين) وقد جاء الدعاء بعد التكبيرة الرابعة وقبل السلام أيضا لما أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الله بن أبي أوفى أنه ماتت ابنة له فيكبر عليها أربعا ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين يدعو ثم قال كان رسول الله يصنع في الجنازة هكذا. (عون المعبود: ٣٥٨/٨)

চতুর্থ হাদীস

إن كنتم سبقتموني بالصلاة عليه فلن تسبقوني بالدعاء দ্বারা উদ্দেশ্য হল, দাফনের পর তিনি দু'আ করেছেন। যেমনটি স্পষ্ট করে অন্য রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে,

عن أسامة بن زيد بن أسلم، قال: جاء كعب الأحبار بعدما دفن عمر رضي الله عنه فقال: والله لئن سبقتموني بدفنه لا تسبقوني بحسن الثناء عليه.

এখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, কা'ব আলআহবার উমর রাযি.এর দাফনের পরে আসেন। তখন বলেন, আল্লাহর শপথ! দেখো তোমরা তাঁর দাফনের ক্ষেত্রে আমার উপর অগ্রগামী হয়েছ। তবে তাঁর প্রতি উত্তম দু'আ করার ক্ষেত্রে তোমরা আমার উপর অগ্রগামী হয়ো না। (তারীখুল মাদীনা ইবনে আবী শাইবা ৩/৯৪০)

এই হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, জানাযার নামাযের পরে নয়; বরং কবরে দাফনের পর দু'আ করা যায়।

সুতরাং লিফলেটে উল্লিখিত আয়াত ও হাদীসের দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, জানাযার পর সম্মিলিত দু'আ একটি বিদআত কাজ। অন্যথায় সেটা প্রমাণের জন্য জালিয়াতির ও ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হত না। নিম্নে আরো কিছু প্রমাণ উল্লেখ করা হল,

১. মিরকাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহতে মোল্লা আলী কারী রহ. বলেন,

ولا يدعو للميت بعد صلاة الجنازة لأنه يشبه الزيادة في صلاة الجنازة.

অর্থ : জানাযার নামাযের পর মাইয়িতের জন্য দু'আ করবে না কেননা এতে জানাযার নামাযে অতিরিক্ত কিছু বৃদ্ধির সংশয় সৃষ্টি হয়। (মিরকাত ৪/১৪৯)

২. খুলাসাতুল ফাতাওয়ায় আছে,

ولايقوم بالدعاء في قراءة القرآن لأجل الميت بعد صلوة الجنازة وقبلها

অর্থ : জানাযার নামাযের পূর্বে এবং পরে মাইয়িতের জন্য কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে দু'আ করবে না। (খুলাসাতুল ফাতাওয়া ১/২২৫)

যেমনটি বর্তমানে বিদআতীরা করে থাকে, জানাযার পরপর সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস পড়ে।

অনুরূপ বক্তব্য রয়েছে হানাফী ফিকহের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আলবাহরুর রায়িক, জামিউর রুমূয ও ফাতাওয়া সিরাজিয়া প্রভৃতিতে। যেমন-

وقيد بقوله بعد الثالثة؛ لأنه لا يدعو بعد التسليم كما في الخلاصة. (البحر الرائق: ٣٢١/٢)

ولا يقوم داعيا له وفي الهامش أي بعد السلام أو قبله. (جامع الرموز مع هامشه غواص البحرين: ٢٨٣/١)

ليس في صلاة الجنازة دعاء موقت إذا فرغ من الصلاة لايقوم بالدعاء. (الفتاوى السراجية: صـ ٢٣)

بعض جگہ یہ رسم ہے کہ میت کو کفنانے کے بعد جنازہ تیار کرکے تمام حاضرین اجتماعی طور پر فاتحہ پڑھتے اور دعا کرتے ہیں اور بعض جگہ نماز جنازہ کے بعد بھی اجتماعی دعا کی جاتی ہے۔

تو یاد رکھئے کہ نماز جنازہ خود دعا ہے، وہ میت اور تمام مسلمانوں کے لئے اتنی جامع اور مفید دعا ہے کہ ہم اور آپ عمر بھی سوچ بچار سے بھی اس سے بہتر دعا نہیں کر سکتے، نماز جنازہ سے پہلے یا بعد اجتماعی دعا یا فاتحہ پڑھنے کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، اس لئے یہ ناجائز اور بدعت ہے۔

اگر کسی کو شبہ ہو کہ تر دعا تو تمام زندہ مردہ مسلمانوں کے لئے ہر وقت جائز ہے، پھر اس موقع پر دعا مکروہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟

جواب یہ ہے کہ فقہائے کرامؒ نے انفرادی طور پر دعا کرنے سے منع نہیں فرمایا، میت کے وقت انتقال، بلکہ اس سے بھی پہلے ویادت کے زمانے سے اس کے لئے فردا فردا دعا مانگنے کا ثبوت احادیث اور فقہ کی کتابوں میں موجود ہے، ہر مسلمان کو اختیار ہے، بلکہ بہتر ہے کہ جب وہ کسی مریض کی عیادت کو جائے، تو اس کے لئے دعا کرے اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کیلئے مغفرت کی دعا کرے اور دفن تک بلکہ اپنی زندگی بھر میت کے لئے دعا کرتا رہے، تلاوت قرآن کریم اور دیگر مالی و بدنی عبادت کا ثواب اسے پہنچتا رہے، ان تمام حالات میں فردا فردا دعا کرنے یا ایصال ثواب کرنے کی کوئی ممانعت نہیں، بشرطیکہ اپنی طرف سے کوئی ایسی بات ایجاد نہ کرے جو شریعت کے خلاف ہو اور کوئی ایسی شرط یا پابندی اپنی طرف سے نہ لگائے، جو شریعت نے عائد نہیں کی۔

اور رحمت عالم ﷺ نے مسلمان میت کے لئے اجتماع کے ساتھ دعا کرنے کا طریقہ صرف وہ مقرر فرمایا ہے، جسے نماز جنازہ کہتے ہیں، انفرادی طور پر ہر شخص، ہر وقت دعا کر سکتا ہے، لیکن جمع ہو کر دعا کرنے کا ثبوت صرف نماز جنازہ کے اندر ہے، اس سے پہلے یا اس کے بعد جن جن مواقع میں دعا کے لئے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے یہ لوگوں کی اپنی ایجاد ہے اور فقہائے کرامؒ اسی اجتماع کو مکروہ اور بدعت فرماتے ہیں۔(احکام میت: ص ۳۷۱)

... پہلا مقدمہ یہ ہے کہ نماز جنازہ بذات خود دعا ہے امام قوم کی معیت میں مرنے والے کے لیے اللہ تعالی کی دربار میں مغفرت اور رفع درجات کے لیے سفارش کرتا ہے۔ دوسرا مقدمہ یہ کے شریعت میں عمل کا وہی بریقہ معتبر ہو گا جس کی اجازت شریعت نے دی ہو۔ اگر کہیں شریعت کے ءمک متوارثہ کی شرعی حیثیت کسی ایسی حرکت سے مجروح ہوتی ہو تو ایسی حرکت سے اجتناب ضروری ہے ...الخ (فتاوی حقانیہ: ۳/۴۵۰)

الجواب ومنہ الصدق والصواب: نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ و تابعین سے ثابت نہیں اسی لئے فقہاء اسے ناجائز اور مکروہ فرمائے ہیں...الخ (احسن الفتاوی: ۱/۳۳۶)

امداد الاحکام: ۱/۱۹۴، فتاوی رحیمیہ: ۷/۱۰۹، فتاوی محمودیہ ۱۳/۱۸۴

এতগুলো স্পষ্ট বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও কিছু আয়াত ও হাদীসের মনগড়া ব্যাখ্যা করে এবং ব্যাখ্যা ও হাওয়ালার ক্ষেত্রে জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে জানাযার পরে সম্মিলিত দু'আ প্রমাণ করা অবশ্যই বিদআত ও নাজায়েয। আয়াত ও হাদীস তো কিতাবে আছে ঠিকই, কিন্তু জানাযার পর সম্মিলিত মুনাজাতের কথা তো সেসব আয়াত ও হাদীসে নেই। এ বিষয়টি মনে হয় লিফলেটের লেখক বেমালুম ভুলে গেছেন এবং হাওয়ালার উপরে বাহাসের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন। আশা করি তিনিও সঠিক মাসআলাটি জানতে পারবেন এবং তদানুযায়ী আমল করতে পারবেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে সঠিক মাসআলার উপর আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

লেখক : ছাত্র, ইফতা বিভাগ,
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া,
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

মাওলানা আব্দুল মজীদ
তুষভাণ্ডার, কালিগঞ্জ, লালমনিরহাট

১৮৬ প্রশ্ন : আমার ছোট বোনের বয়স আঠারো বছর। সদ্য এইচ.এস.সি পাশ করেছে। ভালো রকম মেধাবী। বর্তমানে ডাক্তারী পড়তে ইচ্ছুক। এ ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কী?

বোনকে ডাক্তারী পড়াতে গিয়ে কিছু ঋণ করার প্রয়োজন হলে এ ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

আমি সদ্য বিবাহিত। স্ত্রীকে আমার সঙ্গে রাখতে গেলে বোনের পড়াশোনার প্রয়োজনীয় খরচে ঘাটতি হতে পারে। এজন্য যদি স্ত্রীকে গ্রামের বাড়িতে রেখে বোনের পড়াশোনার ব্যয়নির্বাহে সহায়তা করি এ ব্যাপারে শরীয়তের মতামত কী? উল্লেখ্য, আমার প্রতি মাসেই মাতা-পিতা এবং স্ত্রীর কাছে যাওয়া হয়।

বৃদ্ধ বাবা-মার দেখাশোনা, স্ত্রীকে সঙ্গ দেওয়া এবং ছোট বোনের পড়াশোনায় আর্থিক সহায়তা করা-এই সবদিক বিবেচনায় আমার করণীয় কী?

উত্তর : মহিলাদের জন্য ডাক্তারী পড়া মৌলিকভাবে বৈধ হলেও বর্তমানে ডাক্তারী পড়তে হলে নিয়মিতভাবে পর্দার ফরয বিধান লঙ্ঘন করতে হয়। আর একটি বৈধ কাজ করার জন্য নিয়মিত ফরয তরক করার অনুমতি শরীয়তে নেই। সুতরাং ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে আপনার করণীয় হল, বোনকে ডাক্তারী না পড়িয়ে ফরযে আইন পরিমাণ দীনী ইলম শিক্ষা দিয়ে কোন যোগ্য পাত্রের নিকট বিবাহ দিয়ে দেয়া। কেননা আপনার বোনের জন্য ডাক্তারীবিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যক নয়। শর্ত সাপেক্ষে বৈধ মাত্র। আর অনাবশ্যক কাজের জন্য ঋণ নেয়া এবং এই হেতু স্ত্রীকে দীর্ঘ সময় নিজের কাছ থেকে দূরে রাখাও উচিত নয়।

ডাক্তারী শেখার জন্য মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলে পর্দার ফরয বিধান লঙ্ঘন করার পাশাপাশি চোখের যিনা, মস্তিষ্কের যিনা এবং বেগানা পুরুষের সঙ্গে নির্জনতারও সুযোগ আসে। আর চারিত্রিক নিরাপত্তাহীনতা তো আছেই। কাজেই অনাবশ্যক জ্ঞান অর্জন করতে গিয়ে নিজেকে শরীয়তের ফরয বিধান লঙ্ঘনের আশঙ্কায় ফেলা জায়েয নেই।

বৃদ্ধ পিতা-মাতার টাকা-পয়সা থাকলে তারা নিজেরাই নিজেদের ভরণ-পোষণের ব্যয় বহন করবে এবং অবিবাহিত মেয়ের খরচাদিও তারাই বহন করবে। আর মাতা-পিতা দরিদ্র হলে বড় ভাই তার খরচাদি বহন করবে। প্রশ্নে বর্ণিত সূরতে আপনার বোনের ডাক্তারী পড়াশোনা যেহেতু শরীয়তমতে অনাবশ্যক, সুতরাং এর খরচাদি বহন করা আপনার জন্য জরুরী নয়। বরং যদি আপনি সহায়তা করে মেডিকেল কলেজে ভর্তি করান এবং পরবর্তীতে সে কোন গুনাহে লিপ্ত হয় তাহলে আপনিও গুনাহের অংশীদার হবেন। তবে দীনী ইলম শিক্ষার ক্ষেত্রে তার ব্যয়ভার বহন করা আপনার জন্য জরুরী। (সূরা নূর- ৩১, সূরা আহযাব- ৩৩, মুসনাদে আহমাদ; হা.নং ২৭১৫৫, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৬৫৭, আলআশবাহ ওয়ান-নাযাইর; পৃষ্ঠা ৯৪, ৯৮, ফাতাওয়া শামী ৩/৬০৩, ৬১৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ৬/৮৯)

মুহাম্মাদ হাসিবুর রহমান
স্টেশন রোড, রাজবাড়ি

প্রশ্ন ১৮৭ : (ক) আমার পিতার উপর জীবদ্দশায় হজ্জ ফরয হয়েছিল। কিন্তু তিনি হজ্জ না করেই ইন্তিকাল করেছেন। পরবর্তীতে আমার আম্মা বাবার বদলী হজ্জ করানোর জন্য টাকা দেন। আমাকে বদলী হজ্জ করার জন্য নির্বাচন করা হয়। পৈতৃক সম্পত্তির ভিত্তিতে আমার উপরও হজ্জ ফরয হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে হজ্জ করার মত নগদ অর্থ নেই। এক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন হল-

১. এই হজ্জে আমি বদলী হজ্জের নিয়ত করবো, নাকি নিজের ফরয হজ্জের নিয়ত করবো? এই হজ্জের সফরে যদি আমার ইন্তিকাল হয়, তবে অপর হজ্জের হুকুম কী হবে?

২. নিজের যিম্মায় হজ্জ ফরয হলে বদলী হজ্জ করার বিধান কি?

(খ) আমার মামা ইন্তিকাল করেছেন। আমার মামী যাকাতের নিসাব পরিমাণ টাকার মালিক। কিন্তু আমার দুই মামাতো ভাই বালেগ। তারা গরীব। পৈতৃক সূত্রে জমি-জায়গার মালিক হলেও নগদ টাকার মালিক নয়। এক্ষেত্রে আমার প্রশ্ন হল-

১. এমতাবস্থায় তাদেরকে যাকাত দেয়া যাবে কিনা?

২. যাকাত গ্রহণ করতে না পারার জন্য নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হতে হয়, নাকি সাথে সাথে সম্পদ এক বছরও অতিক্রান্ত হতে হয়?

উত্তর : (ক) ১. পূর্ব থেকে নিজের উপর হজ্জ ফরয থাকা সত্ত্বেও অন্যের পক্ষ থেকে বদলী হজ্জ করা মাকরূহে তাহরীমী। সুতরাং বর্তমান অবস্থায় আপনি পিতার বদলী হজ্জ করতে পারবেন না। বরং নিজের ফরয হজ্জ আদায়ের চেষ্টা করুন।
(ফাতাওয়া শামী ২/৬০৩)

২. প্রশ্নোক্ত বর্ণনা মতে আপনার যেহেতু হজ্জ ফরয, সুতরাং আপনার করণীয় হল, পরিবারের সঙ্গে পরামর্শ করে এ বছর নিজের ফরয হজ্জের নিয়ত করবেন। মা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ সম্ভব হলে ফেরত দিবেন। অথবা অন্য কোন বিজ্ঞ লোককে দিয়ে বদলী হজ্জের ব্যবস্থা করবেন। আপনি অন্য কোনভাবে অর্থ যোগাড় করে হজ্জ করে আসুন। (ফাতাওয়া শামী ২/৬০৪, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/২৫৭, বাদায়িউস সানায়ে ৩/২৭৩, আলমউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আলকুওয়াইতিয়্যা ১৭/৭৪, আলআশবাহ ওয়ান-নাযাইর ১/১০১)

(খ) ১. যদি কেউ এই পরিমাণ জায়গা-জমির মালিক হয়, যা তার নিত্যকার প্রয়োজন পুরা করার কাজে ব্যবহৃত হয় এবং এ ছাড়া নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক সে না হয়; তবে সে যাকাত গ্রহণ করতে পারবে। (আলমউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আলকুওয়াইতিয়্যা ২৩/৩১৫, আলবাহরুর রায়িক ২/৪১৯, ফাতাওয়া শামী ২/৩৪৮, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪/২০৪)

২. যাকাত গ্রহণ নাজায়েয হওয়ার জন্য নিসাব পরিমাণ যাকাতযোগ্য সম্পদের মালিক হলেই হবে। এক বছর অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত নয়। (ফাতাওয়া শামী ২/৩৪৭, আলমউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আলকুওয়াইতিয়্যা ২৩/৩১৪, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১৪/১৮৩)

আব্দুর রহমান
নবীনগর হাউজিং, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা

প্রশ্ন ১৮৮ : নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তির ইমামতি জায়েয হবে কিনা? তিনি যদি জোরপূর্বক ইমামতি করতে চান তাহলে আমাদের করণীয় কি?

১. তিনি ৮২ বছরের বয়ঃবৃদ্ধ। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত। পরিপূর্ণ বিশুদ্ধ তিলাওয়াত জানেন না। কিরাআতে তাজবীদ ও সিফাতের কোন খেয়াল করেন না। তিলাওয়াতে কোন সৌন্দর্য

বা মাধুর্য নেই; বরং বাংলা স্টাইলে কিরাআত পড়েন।
২. দাড়ি এক মুষ্টির কম রাখেন এবং তার দাবী হল, দাড়ি এ পরিমাণ লম্বা রাখাই যথেষ্ট যা দূর থেকে দাড়ি বোঝা যায়।
৩. অধিকাংশ সময় প্যান্ট, শার্ট পরিধান করেন। কোন কোন সময় এ অবস্থায় ইমামতিও করেন। আর যদি পাঞ্জাবী পরিধান করেন তাহলে সেটাও স্বাভাবিকভাবে শার্টের চেয়ে সামান্য লম্বা হয়। ফলে স্থানীয় মুসল্লীগণ তার পিছনে নামায আদায় করতে প্রস্তুত নয়। অথচ নির্ধারিত ইমাম সাহেব রয়েছেন।
৪. তার মধ্যে জামাআতের গুরুত্ব নেই। অধিকাংশ সময় মসজিদে জামাআত চলাকালে নিচে অন্য কাজে সময় কাটান। অনেক ক্ষেত্রে জামাআত শুরু হলে তিনি বের হয়ে চলে যান। সপ্তাহের অধিকাংশ সময় তার এভাবেই কাটে। অথচ মুতাওয়াল্লীর ক্ষমতা প্রদর্শন পূর্বক জুমু'আর নামায পড়ান।
৫. জুমু'আর বয়ানে মুফতিয়ানে কেরাম, তাবলীগ জামাআতের বিরুদ্ধে ব্যাঙ্গাত্মক বক্তব্য দিয়ে থাকেন। বিশেষত তাবলীগের কিতাব সম্পর্কে তিনি বলেন যে, এগুলো সব যঈফ হাদীসে ভরপুর, দুর্বল হাদীস নিয়েই তাবলীগিদের পথচলা।
৬. ০৩-০৬-২০১৬ ইং বয়ানে তিনি বলেন, রমাযান মাসে টিভিতে ছবি দেখার দরকার নেই। শুধু খবর দেখবেন। রমাযানের পর টিভিতে নাটক, ছবি ইত্যাদি দেখবেন।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত অভিযোগসমূহ বাস্তব হলে এমন লোক ফাসিকের অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া এ ব্যক্তি সম্ভবত কোন গোমরাহ দলের সদস্যও হতে পারে। অন্যথায় উলামায়ে কেরাম ও দাওয়াতে তাবলীগের প্রতি তার বিদ্বেষ কেন থাকবে? 'তাবলীগীরা যঈফ হাদীস নিয়ে পথ চলে' এমন কথা বলে তিনি জনসাধারণকে দাওয়াতের কাজে নিরুৎসাহিত করেন, কিন্তু দাড়ি লম্বা রাখার এবং জামাআতে নামায পড়ার ব্যাপারে সহীহ হাদীস থাকা সত্ত্বেও তার বরখেলাফ করে কেন? তাছাড়া রমাযানের পর নাটক দেখা সম্পর্কে কি কোন সহীহ হাদীস তার কাছে বিদ্যমান? মোটকথা, অভিযুক্ত ব্যক্তির ইমামতি শরীয়তমতে মাকরূহে তাহরীমী। তদুপরি যে ইমামের প্রতি মুসল্লীরা গ্রহণযোগ্য কারণবশত অসন্তুষ্ট হয়, তা সত্ত্বেও যদি সে ইমামতি করে সহীহ হাদীসের ভাষ্যমতে তার নামায কবুল হওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু এই ইমাম যেহেতু শরীয়ত সম্পর্কে বেপরোয়া এবং মুতাওয়াল্লীর ঘনিষ্ঠও বটে, কাজেই মুফতীদের ফাতাওয়া তার কোন কাজে আসবে এমন আশা করা যায় না। সুতরাং এক্ষেত্রে সাধারণ মুসল্লীদের করণীয় হল, সম্ভব হলে পার্শ্ববর্তী যে মসজিদে পরহেযগার আলেম ইমাম আছেন, সেখানে গিয়ে নামায আদায় করবে। আর সর্বাবস্থায় ফিতনার পথ এড়িয়ে চলবে। যদি ফিতনা ছাড়া এই লোকের ইমামতি রোধ করা যায় তাহলে সেপথে সব রকম চেষ্টা করে যাবে। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৬৪৪, ৫৮৯২, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪০৩১, সহীহ মুসলিম; হা.নং ২৬৭৪, ফাতাওয়া শামী ১/৫৫২, ৫৫৭, ৫৫৯, ৬৩১, ৬/৪০৭, তাকমিলাতু ফাতহিল মুলহিম ৩/১৬৪, ৪/৮৮, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৪/৮২, খুলাসাতুল ফাতাওয়া ৪/৩৮৮, আলমউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আলকুওয়াইতিয়্যা ৩৬/২৬৫, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১০/১১০)

মাওলানা মুহাম্মাদ ফখরুদ্দীন
ঘিওর, মানিকগঞ্জ

প্রশ্ন ১৮৯ : ফজরের নামাযের পর সূরা হাশরের আয়াত সমস্বরে পাঠ করার বিধান কি?

উত্তর : ফজরের নামাযের পর সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত সারা বছর ব্যাপী সমস্বরে পড়ার যে পদ্ধতি বিভিন্ন মসজিদে রয়েছে তা ঠিক নয়। সঠিক পদ্ধতি হল, কারো ইবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে মুসল্লীগণকে শেখানোর উদ্দেশ্যে কিছুদিন সমস্বরে পড়া যেতে পারে। কারণ সর্বদাই সমস্বরে পড়ার এই পদ্ধতি খাইরুল কুরূন থেকে প্রমাণিত নয়। তাছাড়া সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত পড়া ব্যক্তিগত আমলের অন্তর্ভুক্ত। দলবদ্ধভাবে পড়ার আমল নয়। (ফাতাওয়া শামী ১/৬৬০, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৭/১২০)

মাওলানা মুহাম্মাদ ফখরুদ্দীন
ঘিওর, মানিকগঞ্জ

প্রশ্ন ১৯০ : (ক) বিদ'আতী ইমামের পিছনে নামায পড়ার বিধান কি?
(খ) যে ইমাম এক আলিফ পরিমাণ মদকে দুই আলিফ বা তার চেয়ে অধিক টেনে পড়ে তার নামাযের বিধান কি? কোন আলেম ব্যক্তি তাকে একথা বললে 'এক আলিফকে বেশি টানা মাকরূহে তাহরীমী' তখন ঐ ইমাম বলেন, আমি এটা মানি না। আপনি প্রমাণ দেখান। এমন ইমামের ব্যাপারে শরীয়তের সিদ্ধান্ত কি?

উত্তর : (ক) বিদ'আতী ব্যক্তি যদি কুফরী বা শিরকী কোন আকীদা পোষণ করে, তাহলে এমন বিদ'আতী ইমামের পিছনে নামায আদায় করা জায়েয নেই। এমন বিদ'আতীর পিছনে নামায পড়লে তা আদায় হবে না। পুনরায় আদায় করতে হবে।
আর যদি কুফরী বা শিরকী কোন আকীদা না রাখে তাহলে এমন বিদ'আতী ইমামের পিছনে নামায পড়া মাকরূহে তাহরীমী। যদি কোন সহীহ আকীদাওয়ালা ইমাম পাওয়া যায়, তাহলে তার পিছনে নামায আদায় করবে। অন্যথায় এই বিদ'আতী ইমামের পিছনেই নামায আদায় করবে। জামাআত তরক করা যাবে না। (মুসতাদরাক আলাস সহীহাইন; হা.নং ৪৯৮১, সুনানে বাইহাকী কুবরা; হা.নং ৪১৩৩, মু'জামুত তাবারানী কাবীর; হা.নং ৭৭৭, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ১০৮১, ফাতাওয়া শামী ১/৫৬১, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/২৪৮, আহসানুল ফাতাওয়া ৩/২৯০, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১০/২৩০, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৫/১৯০)
(খ) এক আলিফ মদকে দুই আলিফ বা তার চেয়ে বেশি টেনে পড়া লাহনে খফীর অন্তর্ভুক্ত। ইচ্ছাকৃত এভাবে বেশি টেনে পড়া মাকরূহ। কেউ কেউ হারামও বলেছেন। অবশ্য এভাবে পড়ার কারণে নামায ফাসেদ হবে না। কারাহাতের সাথে নামায সহীহ হয়ে যাবে। পুনরায় তা আদায় করতে হবে না।
ইমাম সাহেবের উচিত হবে, ভবিষ্যতে এভাবে আর বেশি না টানা। প্রয়োজনে তিনি অভিজ্ঞ কারী সাহেবের কাছ থেকে মশক করে নিবেন। (আলকওলুস সাদীদ ফী ইলমিত তাজবীদ; পৃষ্ঠা ৪০, আলওয়াফী ফী কাইফিয়াতিল কুরআনিল কারীম; পৃষ্ঠা ১২৪, কুররাতুল আইন বিফাতাওয়া উলামাইল হারামাইন; পৃষ্ঠা ৪৮, ফাতাওয়া তাতারখানিয়া ২/১১৫, আলমুহীতুল বুরহানী ১/৩৮৫, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ৫/৩৬৬, ফাতাওয়া মাহমূদিয়া ১০/৩৩৪, ফাওয়াইদে মাক্কিয়্যা; পৃষ্ঠা ৪৫)

সফিউল্লাহ
কুমিল্লা

প্রশ্ন ১৯১ : মাইয়িতকে দাফন করার পর তার কাছে কিছুক্ষণ অবস্থান করে তালকীন করা কি বৈধ? ইমদাদুল আহকাম কিতাবে উক্ত তালকীনকে

নাজায়েয বলা হয়েছে। এখন আমার জানার বিষয় হল, এর উপরই কি আমাদের আকাবিরদের ফতওয়া?

উত্তর : দাফন করার পর কবরস্থ ব্যক্তিকে কবরের সুওয়ালের জবাব তালকীন করা জায়েয হওয়ার ক্ষেত্রে উলামায়ে কেরামের ইখতিলাফ রয়েছে। সুতরাং এ পদ্ধতি পরিহার করা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া এটা রাওয়াফিযদের শি'আর তথা নিদর্শন। কিন্তু দাফনের পর কিছুক্ষণ কবরের পাশে দাঁড়িয়ে দু'আ পড়তে কোন অসুবিধা নেই। কেননা দাফনের পর মাইয়িতের মাথার দিকে দাঁড়িয়ে সূরা বাকারার প্রথম তিন আয়াত এবং পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে শেষ তিন আয়াত পড়া হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তাছাড়া এ সময়ে সম্মিলিতভাবে দু'আ করাও জায়েয আছে। পক্ষান্তরে হাদীসে যে মাইয়িতকে কালিমার তালকীন করতে বলা হয়েছে তার দ্বারা উদ্দেশ্য হল মুমূর্ষু ব্যক্তিকে তালকীন করা; কবরস্থ ব্যক্তিকে নয়। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ১২১, ৯১৬, মু'জামুত তাবারানী কাবীর; হা.নং ১৩৬১৩, ফাতহুল মুলহিম ৪/৪২৯-৪৩১, ফাতাওয়া শামী ২/১৯১, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ১/১৭২, ১৭৩, ইমদাদুল মুফতীন ২/৩৭৮, ফাতাওয়া রহীমিয়া ৭/৬৯, ইমদাদুল আহকাম ১/২০৭-২১১, ইমদাদুল ফাতাওয়া ১/৭২৯)

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ
নেত্রকোণা

প্রশ্ন ১৯২ : জনৈক কাজি সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা হল, সরকারী আইন অনুযায়ী তো আঠারো বছর বয়সের আগে বিয়ে করা নিষেধ। কিন্তু আল্লাহর আইনে তো জায়েয আছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো দশ বছরের মেয়ে আয়েশা রাযি.কে বিয়ে করেছিলেন। তখন কাজি সাহেব বললেন, 'সরকারের আইনই ঠিক আছে, আল্লাহর আইনে সমস্যা আছে'।

এখন প্রশ্ন হল, একথা বলার কারণে ঐ কাজি সাহেবের ঈমান কি চলে যাবে? ঈমান গেলে তার বৈবাহিক সম্পর্কের কী অবস্থা হবে? দ্রুত জানালে খুবই উপকৃত হবো। উল্লেখ্য, কাজি সাহেব কওমী মাদরাসার আলেম এবং হাফেয।

উত্তর : শরয়ী বিধান মতে আঠারো বছরের পূর্বে, এমনকি নাবালেগ ছেলে-মেয়ের বিবাহও বৈধ আছে। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হযরত আয়েশা রাযি.কে বিবাহ করেছেন তখন তার বয়স ছিল ছয় বছর। একথা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। পক্ষান্তরে কাজি সাহেবের বক্তব্য 'সরকারের আইন ঠিক আছে, আল্লাহর আইনে সমস্যা আছে' এমন একটি কুফরী বক্তব্য যা দ্বারা ঈমান চলে যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। সুতরাং যদি উক্ত বক্তব্য দ্বারা কাজি সাহেবের সরকারের আইনকে আল্লাহর আইনের উপর প্রাধান্য দেয়া এবং আল্লাহর আইনকে প্রত্যাখ্যান করা কিংবা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তার ঈমান চলে গেছে। তাকে অবশ্যই পুনরায় কালিমা পড়ে ঈমান নবায়ন করতে হবে, বিবাহ দোহরিয়ে নিতে হবে এবং প্রকাশ্যে তাওবা করতে হবে। (সূরা মায়িদা- ৪৪, তাফসীরে ইবনে কাসীর ৩/১৪৩, সহীহ বুখারী; হা.নং ৩৮৯৬, ফাতাওয়া হিন্দিয়া ২/২৮১, ২৯২, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৮/৩৭১)

আবু উবাইদা
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া

প্রশ্ন ১৯৩ : ডাক্তারগণ যদি কোন রোগীর উযূ-গোসলের কোন অঙ্গে অপারেশন ইত্যাদি করার জন্য মেডিসিন লাগায় এবং বলে দেয় যে, এই স্থানে পানি লাগাবেন না। তাহলে তার উযূ-গোসলের কী হুকুম? উল্লেখ্য, উক্ত অঙ্গ এক দিরহাম বা তারচে বড়।

উত্তর : বিজ্ঞ ও মুসলমান ডাক্তারের সিদ্ধান্ত মতে যে অঙ্গে উযূ-গোসলে পানি লাগালে রোগীর জন্য ক্ষতির প্রবল আশঙ্কা আছে, সে অঙ্গে মাসাহ করা সম্ভব হলে মাসাহ করবে। আর যদি মাসাহ করাও ক্ষতিকর হয়, তবে আশপাশের স্থান ধৌত করবে এবং সে অঙ্গ মাসাহ বা ধৌত না করলেও চলবে। (ফাতাওয়া শামী ১/১০২, আলমুহীতুল বুরহানী ১/২০৮)

মুহাম্মাদ মুফীজুর রহমান মিলন
মেরুল বাড্ডা, ঢাকা

প্রশ্ন ১৯৪ : পুরুষের জন্য লাল ও হলুদ রঙের পোশাকের বিধান দলীলসহ জানতে চাই।

উত্তর : পুরুষের জন্য শুধু লাল ও শুধু হলুদ রঙের পোশাক পরিধান করা মাকরূহ বা অপছন্দনীয়। সুতরাং এই দুই রঙ থেকে বেঁচে থাকাই শ্রেয়। হ্যাঁ, যদি লাল ও হলুদের সাথে অন্য রঙের ছাপাও উল্লেখযোগ্য পরিমাণ থাকে তাহলে সে কাপড় পরিধান করা মাকরূহ হবে না। (সহীহ মুসলিম; হা.নং ২০৭৭, সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৮৩৮, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ৪০৬৩, ফাতাওয়া শামী ৬/৩৫৮, আলমউসূ'আতুল ফিকহিয়্যা আলকুওয়াইতিয়্যা ৬/১৩২, ফাতাওয়া দারুল উলূম দেওবন্দ ১৬/১৪৮)

মুহাম্মাদ হাসীবুর রহমান
স্টেশন রোড, রাজবাড়ি

প্রশ্ন ১৯৫ : (ক) সৌদি আরবে মুরগী খাওয়ার হুকুম কি? যেহেতু অনেকে বলে, এগুলো ব্রাজিল থেকে আসে এবং শরীয়তসম্মত উপায়ে জবাই করা হয় না।

(খ) আমরা বাংলাদেশে বিভিন্ন হোটেলে বা রেস্টুরেন্টে মুরগী খাই। এর মধ্যে অনেক রেস্টুরেন্ট আছে যেগুলো বিদেশী হোটেলের শাখা। এছাড়া বিভিন্ন জায়গায় মুরগী পিস পিস করে বিক্রি করে। এগুলো কি খাওয়া জায়েয?

(গ) আমার এক মামা রিয়াদে থাকেন। তিনি বলেন, 'জবাইয়ের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা হয়েছে কিনা তা জানা না থাকলে খাওয়ার শুরুতে বিসমিল্লাহ বললেই হবে। হযরত আয়েশা রাযি. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা বিভিন্ন সময় কাফের-মুশরিকদের দাওয়াত খাই, তখন করণীয় কি? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত কথা বলেছিলেন।' এই মর্মে একটি হাদীস আছে বলে মামা বললেন। এই হাদীসের ব্যাখ্যা কি? হাদীসটি কোন কিতাবে আছে? এই মাসআলাটি সঠিক কিনা? এক্ষেত্রে আমাদের মাযহাবের বক্তব্য কি?

উত্তর : (ক) যে সকল মুরগী সৌদির মাযবাহ বা জবাইখানায় মুসলিম ব্যক্তির মাধ্যমে শরীয়তসম্মত পন্থায় জবাই করা হয়, সেগুলো খাওয়া সম্পূর্ণ হালাল। পক্ষান্তরে সৌদিতে অমুসলিম দেশ তথা ব্রাজিল, ফ্রান্স, ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশ থেকে যেসব জবাইকৃত মুরগীর গোশত আমদানী করা হয়, সেগুলো খাওয়া জায়েয হবে না, যতক্ষণ না নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, সেগুলো শরীয়তসম্মত পন্থায় জবাই করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, অমুসলিম দেশ থেকে আমদানীকৃত গোশতের কৌটা বা প্যাকেটে লেখা থাকে انها مذبوحة على الطريقة الاسلامية বা ذبحت على الطريقة الاسلامية অর্থাৎ এগুলো ইসলামী শরীয়তসম্মত পন্থায় জবাই করা হয়েছে। এই লেখার উপর নির্ভর করা যায় না। এ বিষয়ে সৌদির উচ্চতর ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান الرياسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء (আর-রিয়াসাতুল আম্মাহ লি ইদারাতিল বুহুসিল ইসলামিয়্যা

ওয়াল-ইফতা) বিশদ গবেষণা এবং দীর্ঘ পর্যবেক্ষণ ও অনুসন্ধানের পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, অমুসলিম দেশগুলো থেকে যে সকল গরু, ছাগল, ভেড়া বা মুরগী ইত্যাদির গোশত আমদানী করা হয়, সেগুলো সেখানে শরীয়তসম্মত পন্থায় জবাই করা হয় না। তবে যদি নিশ্চিতভাবে কোন অমুসলিম দেশের গোশত সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান বা কোন নির্দিষ্ট প্যাকেটের গোশত সম্পর্কে জানা যায় যে, সেই গোশতগুলো মুসলিম ব্যক্তির মাধ্যমে শরীয়তসম্মত পন্থায় জবাই করা হয়েছে তাহলে তা খাওয়া যাবে।

সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য, এসব বিষয়ে খুবই সতর্ক থাকা। কারণ ইবাদত-বন্দেগী কবুল হওয়ার অন্যতম একটি শর্ত হল, হালাল খাবার গ্রহণ করা। এক্ষেত্রে এমন সূরত হতে পারে যে, উট, গরু, দুম্বা, মুরগী ইত্যাদির গোশত খেতে ইচ্ছুক ব্যক্তি সৌদির স্থানীয় কোন মুসলিম হোটেল থেকে অথবা গোশত কিনতে ইচ্ছুক ব্যক্তি স্থানীয় কোন মুসলিম দোকান থেকে গোশত কিনবেন, যেখানে অমুসলিম দেশ থেকে আমদানীকৃত গোশত বিক্রি করা হয় না; বরং মুসলিম ব্যক্তির মাধ্যমে শরীয়তসম্মত পন্থায় পশু-পাখি জবাই করে তার গোশত বিক্রি করা হয়। (সূরা আন'আম- ১২১, সূরা হজ্জ- ৩৪, সূরা মায়িদা- ৩, সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৪৯৮, ৩৮২৬, বুহুস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যা মু'আসারা ২/২৬, ৯০-৯৪, আবহাসু হাইআতু কিবারিল উলামা ২/৭৩৩-৭৩৯)

(খ) আমাদের দেশে যে সকল বিদেশী হোটেল বা রেস্টুরেন্ট আছে, সেগুলোর মধ্য হতে যেগুলো মুসলিম দেশের হোটেল বা রেস্টুরেন্টের শাখা সেগুলোতে গোশত খাওয়া যাবে, যতক্ষণ না জানা যায় যে, সেগুলো শরীয়তসম্মত পন্থায় জবাই করা হয়নি।

পক্ষান্তরে অমুসলিম দেশ তথা হল্যান্ড, ডেনমার্ক, ব্রাজিল ইত্যাদি অমুসলিম দেশের শাখা হোটেল বা রেস্টুরেন্টে গোশত খাবে না। হ্যাঁ, যদি সেখানে মুসলিম কর্মচারী দ্বারা শরীয়তসম্মত পন্থায় জবাইয়ের ব্যবস্থা করা হয় অথবা 'কোন মুসলিম কসাইয়ের দোকান থেকে গোশত কিনে এনে তা পরিবেশন করা হয়' মর্মে জানা যায় তাহলে সে গোশত খাওয়া যাবে। (মুআত্তা ইমাম মালেক; হা.নং ১০১৬, আওজাযুল মাসালিক ১০/১২, ১৩, বুহুস ফী কাযায়া ফিকহিয়্যা মু'আসারা ২/৩৯-৪১)

(গ) প্রশ্নে বর্ণিত হাদীসটির বর্ণনা সঠিক নয়। এর সঠিক বর্ণনা নিম্নরূপ-

হযরত আয়েশা রাযি. থেকে বর্ণিত, একদল লোক নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের কাছে গোশত (বিক্রি করতে) আনে। অথচ আমাদের জানা থাকে না যে, (তা জবাই কারর সময়) আল্লাহ তা'আলার নাম উল্লেখ করা হয়েছে, নাকি হয়নি। (এমতাবস্থায় আমাদের করণীয় কি?) তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা আল্লাহর নামে তা খেয়ে নাও। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, তারা ছিলেন নতুন মুসলমান। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৫০৭)

হাদীসটি সহীহ বুখারী, সুনানে ইবনে মাজাহ, সুনানে নাসায়ী, সুনানে আবূ দাউদসহ হাদীসের বিভিন্ন কিতাবে বর্ণিত হয়েছে।

এ হাদীসে বলা হয়েছে যে, আরবীয় বেদুঈন নওমুসলিমরা মদীনার বাজারে উট, দুম্বা ইত্যাদির গোশত নিয়ে এসে বিক্রি করত। এতে অনেক সাহাবীর মনে এ সংশয় তৈরি হয়েছিল যে, যেহেতু তারা (অর্থাৎ আরবীয় বেদুঈন নওমুসলিম) ইতোপূর্বে অমুসলিম ছিলেন, কাজেই তারা হয়তো জবাইয়ের নিয়ম-পদ্ধতি সম্পর্কে অনবগত হয়ে থাকবেন ফলে পশু-পাখি জবাই করার পূর্বে আল্লাহর নাম না নিয়েই জবাই করবেন। এতে করে তাদের থেকে যারা গোশত খরিদ করে আহার করবে, তারা সকলেই হারামে লিপ্ত হবে।

তখন সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন যে, হে আল্লাহর রাসূল! নওমুসলিমরা যে আমাদের কাছে গোশত নিয়ে আসে, আমরা তো জানি না যে, তারা আল্লাহর নামে পশুগুলো জবাই করেছিল কিনা? নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমরা বিসমিল্লাহ বলে তা খেয়ে নাও।

এখানে বিসমিল্লাহ বলে খেয়ে নিতে বলার দ্বারা এটা বোঝানো হয়নি যে, এরূপ সংশয়ের ক্ষেত্রে খাওয়ার সময় বিসমিল্লাহ বললে সেটা জবাই করার সময় 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলার স্থলাভিষিক্ত হবে। বরং এটা বোঝানো হয়েছে যে, এরূপ ক্ষেত্রে কোন সংশয় না করে; বরং মুসলমানদের ব্যাপারে সুধারণা রেখে বিসমিল্লাহ বলে খেয়ে নিতে হবে। যেহেতু জবাইকারী একজন মুসলমান, কাজেই বাহ্যত সে শরীয়ত-সম্মতভাবেই জবাই করে থাকবে– এ সুধারণা রাখতে হবে। সুতরাং তা খাওয়া হালাল, যতক্ষণ না নিশ্চিতভাবে জানা যায় বা প্রবল ধারণা হয় যে, তা শরীয়ত-সম্মতভাবে জবাই করা হয়নি। আর এটাই আমাদের মাযহাব।

উল্লেখ্য, কাফের-মুশরিকদের জবাইকৃত পশু-পাখি কোন অবস্থাতেই খাওয়া জায়েয হবে না। (সহীহ বুখারী; হা.নং ৫৫০৭, সুনানে আবূ দাউদ; হা.নং ২৮২৬, সুনানে নাসায়ী; হা.নং ৪৪৩৬, সুনানে ইবনে মাজাহ; হা.নং ৩১৭৪, মুআত্তা ইমাম মালেক; হা.নং ১০১৬, আওজাযুল মাসালিক ১০/৯-১৪)

মুহাম্মাদ সাআদ
রায়ের বাজার, ঢাকা

প্রশ্ন ১৯৬ : একজন বাড়ির মালিক এ শর্তে বাসা ভাড়া দিচ্ছে যে, বিশ হাজার টাকা অ্যাডভান্স দিলে মাসিক ভাড়া হবে দশ হাজার, আর দুই লক্ষ টাকা অ্যাডভান্স দিলে মাসিক পাঁচ হাজার টাকা ভাড়া দিলেই চলবে।

জানার বিষয় হল, মালিক ও ভাড়াটিয়ার মধ্যকার এই লেনদেন শরীয়তসম্মত হচ্ছে কিনা? যদি না হয় তাহলে এই লেনদেনের শরীয়তসম্মত পন্থা কী হবে?

উল্লেখ্য, বর্ণিত সূরতে বিশ হাজার বা দুই লক্ষ টাকা নির্ধারিত সময় শেষ হলে ফেরত দেয়া হবে অথবা ভাড়া বাবদ কর্তন করা হবে।

উত্তর : ইসলামী শরীয়ত মতে ফেরতযোগ্য অ্যাডভান্সের টাকা করযের অন্তর্ভুক্ত। আর করয দ্বারা বৈষয়িকভাবে উপকৃত হওয়া সুদের শামিল। কাজেই ঋণ হিসেবে অ্যাডভান্স দেয়ার কারণে বাড়ি ভাড়ার মধ্যে যে পরিমাণ কম করা হবে সে পরিমাণ সুদ গ্রহণের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তা হারাম হবে। শরীয়তের এ নীতির আলোকে প্রশ্নোক্ত লেনদেন সহীহ নয়।

পক্ষান্তরে অগ্রিম ভাড়া, যা নির্ধারিত চুক্তি অনুযায়ী মাসিক ভাড়ার মাধ্যমে কর্তন হতে থাকবে, তা কম-বেশির কারণে ভাড়ার মধ্যে স্বাভাবিক কম-বেশি হতে পারে। এক্ষেত্রে অগ্রিম পরিশোধিত টাকা কত বছরের বা কত মাসের ভাড়া বাবদ পরিশোধ করা হচ্ছে তা আগেই নির্ধারণ করে নিতে হবে। (ফাতাওয়া শামী ৪/৪১৮, ৫/১৬৬, ৬/৩৯৪)

ইলম থেকে মাহরূমির কারণসমূহ ও প্রতিকার

মুফতী ইবরাহীম হেলাল দা.বা.

ইলম আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহের মধ্যে অন্যতম বড় নেয়ামত। হাদীসে এসেছে, 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকে দীনের বুঝ দান করেন।' ইলমের নেয়ামত কেবল সৌভাগ্যবানদের নসীবেই জোটে। তালিবে ইলমদের এই নেয়ামতের অনুভূতি থাকা উচিত।

ইলমে দীনের এই অবক্ষয়ের যুগে –যখন সকল মানুষ দুনিয়ামুখী– গুটিকয়েক মানুষ মাত্র ইলম হাসিলের পথে অগ্রসর হয়। যারা আসে তারা দুনিয়া ছেড়ে আখেরাত লাভের উদ্দেশ্যেই আসে। এটা অনেক বড় কুরবানী। এতবড় কুরবানীর তাকাযা তো ছিল সবাই তাদের মনযিলে মাকসূদে পৌঁছতে সক্ষম হবে, আদর্শ আলেম হবে। কিন্তু দুঃখজনকভাবে লক্ষ্য করা যায়, বহু তালিবে ইলম এই নেয়ামত পাওয়ার পরও তা থেকে মাহরূম হয়, বঞ্চিত হয়। ফলে দুনিয়ার পাশাপাশি তাদের আখেরাতও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

কিছু তালিবে ইলম এমন আছেন, ভালোভাবে পড়াশোনার একপর্যায়ে বাহ্যিক কোন কারণ ছাড়াই হঠাৎ মাদরাসা ছেড়ে চলে যান। এসব মাহরূমির মূল কারণ হচ্ছে, তারা মাহরূমির আসবাবের ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন না। তাতে জড়িয়ে পড়েছিলেন। তাই তাদের মাহরূমী অনিবার্য ছিল। এজন্য জানা প্রয়োজন কী কী কারণে ইলম থেকে মাহরূম হতে হয়। আমরা এখানে কিছু কারণ নিয়ে আলোচনা করছি। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ইলম থেকে মাহরূমির এসব আসবাব থেকে হেফাযত করুন।

১. গুনাহ করা

সকল প্রকার গুনাহই ইলম হাসিলের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। কারণ ইলম হচ্ছে নূর বিশেষ। আর গুনাহ হচ্ছে যুলমাত বা অন্ধকার। ইমাম শাফেয়ী রহ.এর বিখ্যাত ঘটনা। তিনি তার উস্তাদ ওয়াকী' রহ.এর নিকট স্মরণশক্তির দুর্বলতার কথা জানালে তিনি বলেছিলেন, 'গুনাহ ছেড়ে দাও। কারণ ইলম হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর। আর আল্লাহর নূর কোন গুনাহগারকে দেয়া হয় না।' তাই সব ধরনের গুনাহই বর্জন করা চাই। তবে মাহরূমির অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত কিছু গুনাহ হচ্ছে,

(ক) দৃষ্টির হিফাযত না করা। কুদৃষ্টি একটি মারাত্মক গুনাহ। কারণ النظر سهم من سهام ابليس (দৃষ্টি শয়তানের তীরসমূহের মধ্য থেকে একটি তীর)। মানুষ বিভিন্ন কারণে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে। যেমন- লজ্জিত হওয়ার ভয়ে, সুযোগ না পাওয়ার কারণে কিংবা অর্থ সঙ্কটের কারণে। কিন্তু কুদৃষ্টি এমন এক গুনাহ, যা করতে এ সবের প্রয়োজন হয় না এবং এটা যে গুনাহ এই অনুভূতিও অনেকের থাকে না। দাড়িবিহীন বালকদের প্রতি কুদৃষ্টি দেয়া তো আরো জঘন্য। কতক আহলে কাশফ বুযুর্গের অভিমত হল, 'আল্লাহ যখন কাউকে তার দরবার থেকে বিতাড়িত করতে চান, তখন তাকে সুদর্শন বালকের মহব্বতে লিপ্ত করে দেন'। কুদৃষ্টির কারণে চোখে অন্তরে এমন যুলমাত সৃষ্টি হয় যে, সামান্য অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিও তা অনুভব করতে পারে।

তাছাড়া এই গুনাহ এমন সুপ্ত হয়ে থাকে যে, নিজেকে বুযুর্গ মনে করে এমন অনেকেই মনের অজান্তে এ গুনাহে লিপ্ত থাকেন। তাই তালিবে ইলমদের এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা চাই এবং আল্লাহ না করুন কেউ এতে লিপ্ত হয়ে পড়লে ইসলাহের ফিকির করা চাই।

(খ) ছাত্র যামানায় মোবাইল ব্যবহার করা। এর সর্বনিম্ন ক্ষতি হচ্ছে, একাগ্রতায় বিঘ্ন ঘটা, যা ইলম হাসিলের ক্ষেত্রে অন্তরায়। আর প্রধান প্রধান ক্ষতির কথা তো বলাই বাহুল্য। কারণ ইন্টারনেট সহজলভ্য হওয়ার পাশাপাশি প্রযুক্তির উৎকর্ষে মোবাইলে দিন দিন এমন সব ফিচার যুক্ত হচ্ছে, যা গুনাহকে সহজ থেকে সহজতর করে তুলছে। দুনিয়ার সকল খারাবী যেন এই 'মুঠোফোনে' আক্ষরিক অর্থেই হাতের মুঠোয় এসে পড়েছে। আরো আশ্চর্যের বিষয় হল, কতক অভিভাবক ভালো ফলাফল করায় কিংবা আব্দার মেটাতে সন্তানের হাতে মোবাইল তুলে দেন। আর আশা করেন, তার সন্তান সামনে থেকে আরো ভালো পড়াশোনা করবে। অথচ তিনিই স্বয়ং তার সন্তানের ইলম থেকে মাহরূম হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ালেন। তাই তালিবে ইলমের যেমন মোবাইলকে বিষতুল্য মনে করে এর থেকে বেঁচে থাকা উচিত; তেমনি অভিভাবকেরও এ ব্যাপারে সতর্ক ও কঠোর ভূমিকা পালন করা উচিত।

(গ) মাদরাসার পরিবেশের বাইরেও গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা। যেমন বাড়িতে গাইরে মাহরাম তথা ভাবি, চাচি, মামি, খালাতো-চাচাতো-মামাতো বোনসহ অন্যান্যদের থেকে পর্দা না করা। গান-বাজনা শোনা, টিভি দেখা ইত্যাদি। যাদেরকে দিয়ে আল্লাহ দীনের হিফাযত করবেন, তারা নিজেরাই যদি দীনকে পয়মাল করে; তবে কীভাবে আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাদেরকে উম্মতের রাহনুমা বানাবেন?!

কারো বাড়ির পরিবেশ এমন থাকলে নিজে এসব থেকে পরহেয করা ও এ ব্যাপারে প্রয়োজনে কঠোরতা করা। চাই কেউ তাতে অসন্তুষ্টই হোক না কেন। কারণ খালিককে অসন্তুষ্ট করে মাখলুককে সন্তুষ্ট করা জায়েয নেই।

২. হারাম থেকে না বাঁচা

হারাম খাওয়া-পরাও ইলম থেকে মাহরূম হওয়ার কারণ। তালিবে ইলমের খোঁজ রাখা উচিত যে, তার অভিভাবকের উপার্জন হালাল কিনা। এমন গুরুতর বিষয়েও অনেকে উদাসীন থাকেন। কারো অভিভাবক হয়ত ব্যাংকে চাকুরী করেন। কিংবা কোন সূদী লেনদেনে জড়িত। কখনো আত্মীয়-স্বজন বা মুহিব্বীনের উপার্জনের ব্যাপারে না জেনেই তার দাওয়াত রক্ষা করেন। তাই কারো অভিভাবকের উপার্জন যদি হারাম হয়েই থাকে, সেক্ষেত্রে করণীয় হল, যতটুকু না হলেই নয় ততটুকু গ্রহণ করা এবং আল্লাহর কাছে ইস্তিগফার করা। সেই সঙ্গে অভিভাবকের জন্যও দু'আ করা ও তাকে হারাম উপার্জন থেকে ফেরানোর চেষ্টা করতে থাকা। কারণ হারাম দ্বারা গঠিত শরীর দ্বারা ইলম হাসিলের আশা করা দুরাশা বৈ কিছুই নয়। **(২১ পৃষ্ঠায় দেখুন)**

কিশোর প্রতিভা

মারকায যায়েদ বিন ছাবেত রাযি.

মৃত্যু অবধারিত। কেউ বাঁচতে পারবে না তার কবল থেকে; পারেওনি আজ পর্যন্ত। নবী-রাসূল পীর-পয়গম্বর কেউ না। মৃত্যু এমন এক ব্যাধি যার চিকিৎসা নেই। মহান আল্লাহর বাণী 'প্রত্যেক প্রাণীকে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে'। মৃত্যুদূত সবার দুয়ারে আসবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। যেভাবে পূর্ববর্তী লোকদের নিকট এসেছে, এখনো সেভাবেই আসছে। এভাবে চলতেই থাকবে কিয়ামত অবধি; কেউ থামাতে পারবে না। যে কেউ আল্লাহ পাকের হুকুম মেনে চলেছে সারা জীবন, তার সামনে মৃত্যুদূত উপস্থিত হবে জান্নাতের সুসংবাদ নিয়ে। আর যার জীবন কেটেছে আল্লাহর নাফরমানীতে, মৃত্যুদূত তার সামনে উপস্থিত হবে ভয়ঙ্কর রূপে। কারো মৃত্যুর পর তাকে বেদনাপ্লুত হৃদয়ে স্মরণ করা হয়, আর কারো নাম-পরিচয় ছুড়ে ফেলা হয় অবজ্ঞা ভরে। এটাই দুনিয়ার চিরাচরিত নিয়ম। এরই ধারাবাহিকতায় মৃত্যুর ডাকে সাড়া দিয়েছেন আরবী ভাষা ও সাহিত্যের নিরলস সাধক, বাংলাদেশে আধুনিক আরবী সাহিত্যের দিকপাল, স্বনামধন্য আলেমে দীন আল্লামা শহীদুল্লাহ ফযলুল বারী রহ.। তার মৃত্যুতে আমরা ব্যথিত, মর্মাহত। অনেক বড় মাপের আলেম ও সুসাহিত্যিক ছিলেন তিনি। আরবী ভাষাকে বেছে নিয়েছিলেন জীবনের পাথেয় হিসেবে। ছিলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একনিষ্ঠ আশেক। রাসূলের ভাষাকে তিনি ভালোবাসতেন মনেপ্রাণে। আরবী ভাষায় তালিবে ইলমদের জন্য উচ্চতর দক্ষতা অর্জনের নিমিত্তে তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন বহু প্রতিষ্ঠান। যায়েদ বিন ছাবেত রাযি. ভাষা প্রশিক্ষণকেন্দ্র তার অন্যতম। তিনি আরবী ভাষার মহব্বত আমাদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে করেছেন অক্লান্ত পরিশ্রম। আজ তিনি বেঁচে নেই। মাওলা পাকের ডাকে সাড়া দিয়ে চিরনিদ্রায় শায়িত। যারা ক্ষুদ্র এ জীবনে বৃহৎ কিছু করতে পেরেছেন তিনি তাদের অন্যতম। তার প্রতিষ্ঠান থেকে একদিন তৈরি হবে নদবী, থানবীর মত সুসাহিত্যিক, দীনে মুহাম্মাদিয়ার সরস উপস্থাপক এটাই ছিল তার পরম বাসনা। সেই বাসনা একদিন পূরণ হবেই ইনশা-আল্লাহ। আল্লাহ পাক তার প্রতিষ্ঠানকে ভরপুর কামিয়াবী দান করুন। তার কবরকে জান্নাতের টুকরা বানিয়ে দিন।

মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আলমামুন
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

ক্ষুদ্র দিয়ে মুক্তো পেলাম

কিছুদিন আগের কথা। তখন আমি বাইতুল ফালাহ মাদরাসায় মীযান জামাআতে পড়ি। মাদরাসার মসজিদে যোহরের নামায় আদায় করে ওযীফা পাঠ করছিলাম। চোখ পড়ল দু' কাতার সামনে এক নূরানী ছুরত বৃদ্ধের ওপর। আরে! ইনি তো শাইখুল হাদীস হযরত আশরাফ আলী সাহেব দা.বা.। নামায পড়ছেন। না, এই সুযোগ কিছুতেই বেহাত করা যাবে না। তার কোন না কোন খিদমতে নিজেকে পেশ করতে হবে। এমন সময় পেছন থেকে ডাক পড়ল– নাজমুল! তাকিয়ে দেখি, মুহতামিম সাহেব হুযূর। বললেন, হযরত বৃদ্ধ মানুষ, তাকে ধরে ধরে মেহমানখানায় নিয়ে এসো। তার নামায-অযীফা শেষ হতেই সালাম দিলাম। ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়ারাহমাতুল্লাহ বলে জিজ্ঞেস করলেন, কী নাম তোমার? আমি নাম বললাম। তারপর তাকে হাত ধরে মেহমানখানায় নিয়ে এলাম। তিনি জানতে চাইলেন আমি হাফেয কিনা? হাঁ বাচক উত্তর দেওয়ায় একটি আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোথায় আছে? বললাম, অমুক পারার অমুক পৃষ্ঠায় আছে। তিনি দেখতে চাইলে একটি কুরআন শরীফ এনে উক্ত পৃষ্ঠাটি বের করে তার হাতে দিলাম। তিনি দীর্ঘ সময় ধরে দেখতে থাকলেন এবং মাথা নেড়ে নেড়ে কি যেন বললেন। তারপর মাথা তুলে মুচকি হেসে বললেন, বাবা! তোমার জন্য কি দু'আ করা যাবে? আমি লজ্জিত হয়ে বললাম, অবশ্যই ইনশা-আল্লাহ। তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দু'আ করলেন। তাকে খুশি করতে পেরে আমার মনটাও খুশিতে ভরে গেল। ভাবছি, এমন ক্ষুদ্রতর সেবাই যদি এনে দেয় এমন অমূল্য ধন তবে এটুকু করতে অসুবিধা কি?

মুহাম্মাদ নাজমুল ইসলাম (ফরিদপুরী)
জামি'আ ইলয়াসিয়া ইসলামিয়া, ঢাকা

যিয়ারত করে এলাম পাহাড়পুরী হুযূরকে

ঘুম থেকে ওঠার পর থেকে মনটা কেমন যেন অস্থির অস্থির লাগছে। বেলা বাড়ার সঙ্গে অস্থিরতাও বাড়ছিল। এর কারণ, কয়েকদিন পূর্বে এই নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করে, মায়ার সকল বাঁধন ছিন্ন করে আপন মাওলা পাকের সান্নিধ্যে পাড়ি জমিয়েছেন লাখো উলামা-তলাবার হৃদয়ের স্পন্দন, সত্যের মশালধারী আমাদের প্রিয় 'পাহাড়পুরী হুযূর রহ.'। তার প্রথম দর্শন লাভে ধন্য হয়েছিলাম আমাদের জামি'আয়; হযরত মুহাদ্দিস সাহেব হুযূর রহ.এর জীবনী শীর্ষক এক আলোচনা সেমিনারে। কল্পনাও করিনি, প্রথম দেখাই হবে তার সঙ্গে আমার শেষ দেখা! তারপর আর হুযূরের নূরানী চেহারার দর্শন এই অভাগার কিসমতে জোটেনি। হুযূরের জানাযায়ও শরীক হওয়ার তাওফীক হয়নি আমার। তাই ভাবলাম, পাহাড়পুরী হুযূরের মাকবারা যিয়ারত করে আসি। এতে হয়তো অন্তরে সুকূন ও সাকীনা এবং নূর ও নূরানিয়াত হাসিল হবে। সবক বন্ধ থাকায় দু'জন সাথী ভাইকে সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হলাম।

আল্লাহ তাওফীক দিলেন তার পেয়ারা বান্দার মাকবারা যিয়ারতের। দূর হল ক্লান্তি-অবসাদ। সিক্ত হল তপ্ত হৃদয়। সমাপ্তি ঘটল এক অশান্তি ও অস্থিরতার। অনুভূত হল এক স্বর্গীয় প্রশান্তি, যা শুধু অনুভবই করা যায়। তিনি আমাদেরকে ছেড়ে শুয়ে আছেন নূরিয়ার আম্রকাননে। আল্লাহ তা'আলা আমাদের প্রিয় পাহাড়পুরী হুযূরকে তার পেয়ারা বান্দা হিসেবে কবুল করুন এবং তাকে জান্নাতের সুউচ্চ মাকাম দান করুন। আর আমাদেরকে তার ফুয়ূয ও বারাকাত দিয়ে উভয় জাহানে কল্যাণ ও সাফল্য দান করুন। আমীন।

মুহাম্মাদ শু'আইব আহমাদ
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

সফল জীবনের খোঁজে

প্রতিটি বস্তুই সময় ও কালের হাতধরে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসে; পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। তেমনিভাবে দুগ্ধপোষ্য শিশুও ধীরে ধীরে হাঁটতে শেখে, বলতে শেখে, বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগতে শেখে। তারপর পর্যায়ক্রমে শৈশব, কৈশোর, যৌবন, বার্ধক্য এ ধাপগুলো অতিক্রম করে। আর এভাবেই প্রতিটি শিশু একদিন দৈহিক পূর্ণতায় পৌঁছে। অবশেষে পাড়ি জমায় পরকাল অভিমুখে। আবার কেউ এর মাঝেই চলে যায় চিরবিদায় নিয়ে।

তবে শুধু দৈহিক পূর্ণাঙ্গতার দ্বারা মানুষ পরিপূর্ণ পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে পারে না।

বরং পূর্ণাঙ্গতার মাপকাঠি হল আত্মিক পূর্ণতার উপর। আর তা অর্জন হবে, (১) ইলমে ওহী হাসিল করা, (২) সে অনুযায়ী আমল করা ও (৩) আত্মাকে পরিশুদ্ধ করার দ্বারা। প্রথমটির জন্য উস্তাদের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিক মেহনত করা। দ্বিতীয়টির জন্য (ক) সাহাবায়ে কেরাম ও আকাবিরের আমলের অধ্যায় মুতালা'আ করা, (খ) পরস্পরে আমলের প্রতিযোগিতা করা, (গ) দু'আতে বেশি বেশি নেক আমলের তাওফীক চাওয়া। আর তৃতীয়টির জন্য (ক) হক্কানী পীর ও শাইখের কাছে যাওয়া, (খ) তার রাহনুমায়ী অনুযায়ী মুজাহাদা করে আত্মার ময়লা দূর করা এবং আত্মার জন্য আবশ্যক গুণগুলো অর্জন করা।

এসব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মার পূর্ণতা লাভের পর আরও কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়। (১) অন্যের কাছে ইলম পৌঁছে দেয়া। (২) সুন্নাতের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করা, (৩) মৃত ও নিভুপ্রায় সুন্নাতকে পুনরায় ওজুদে নিয়ে আসা। সকল কাজ ইখলাসের সঙ্গে করা। এভাবে কেউ যদি নিজের জীবন পরিচালনা করতে পারে, আশা করা যায়, সে জীবনের স্বার্থকতা এবং পূর্ণাঙ্গতা অর্জন করতে পারবে; ইনশা-আল্লাহ।

মুহাম্মাদ রাজিউল ইসলাম (ঝিনাইদহ)
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

বাইতুল্লাহর টানে...

কত স্বপ্নই না মানুষ দেখে; কিন্তু সব স্বপ্ন তো আর বাস্তব হয় না। অসংখ্য স্বপ্ন উঁকি দিয়েই হাওয়া হয়ে যায়। কিন্তু এ স্বপ্নটি প্রতি বছর আমায় আবেগতাড়িত করে তোলে।

২০১৬ খ্রিস্টাব্দ। এ বছর যখন হজ্জের মৌসুম গড়িয়ে এলো, তখন আমাদের প্রাণপ্রিয় উস্তাদগণ আমাদেরকে দরসের ফাঁকে ফাঁকে আল্লাহর ঘর বাইতুল্লাহর নানা গল্প শোনাতেন। তখন তাদের নূরে উদ্ভাসিত চেহারার দিকে অপলকনেত্রে তাকিয়ে থাকতাম। আর হৃদয়পটে বাইতুল্লাহর ছবি আঁকতাম। মনে হতো, বাইতুল্লাহ আমার সামনে দৃশ্যমান, আমি তা দেখে দেখে ছবি অঙ্কন করছি। আরো মনে হতো, আমি যেন বাইতুল্লাহর শীতল ছায়ায় বসে আছি। যখনই বাইতুল্লাহর কথা মনে পড়ে হৃদয়টা হুহু করে ওঠে। কবে যাবো আল্লাহর ঘরে, কবে যাবো দোজাহানের নবীর রওযা যিয়ারতে। মনকে সান্ত্বনা দেয়ার কোন অজুহাত খুঁজে পাচ্ছি না। শুধু এতটুকু বলি যে, আমি তো আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করছি; আল্লাহ তা'আলা নিশ্চয়ই তাঁর করুণায় নিয়ে যাবেন তাঁর ঘর এবং তাঁর হাবীবের রওযা যিয়ারতে। এ নিয়ে ভাবতে ভাবতে জন্ম নিল একটি ছড়া-

মন মাতানো পাখির সুরে
ডানা মেলে যাবো উড়ে
তোমার ঘরের যিয়ারতে
ওগো প্রভু দোজাহানে।
তোমার ঘরে যেতে আমি
দু'আ করি দিন-রজনী
তোমার কথা ভাবতে গেলে
নয়ন থেকে অশ্রু ঝরে।
মরার আগে যাব আমি
দেখতে তোমার উঠানখানি
কবুল করো আমায় প্রভু
তাড়িয়ে দিও না'কো কভু।

মুহাম্মাদ রাফিউল ইসলাম
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ভ্রমণ

ঠং ঠং ঠং। দুপুর বারোটা। সূর্য মধ্যাকাশে। ২৪শে মার্চ ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ। দ্রুত সফরের প্রয়োজনীয় সামানপত্র গুছিয়ে রওয়ানা হলাম। সূর্যের তাপমাত্রা ছিল খুবই প্রখর। ট্রেনযোগে এক দীর্ঘ সফর যা জীবনের এই প্রথম। এমন উপভোগ্য মুহূর্ত কি আর রোদের বাহানায় হাতছাড়া করা যায়? রেল স্টেশনে পৌঁছলাম। তখন সাড়ে তিনটা বাজে। টিকিট সংগ্রহ করি। তিতাস বাংলাদেশ রেলওয়ে। ছাড়ার সময় বিকাল ৫ টা ৪০ মিনিট। বেশ দীর্ঘ সময়। ঘুরে ঘুরে কমলাপুরের দর্শনীয় স্থানসমূহ দেখতে লাগলাম। সফরসঙ্গী হিসেবে আছে তাশরীফ, মুহাম্মাদ, হুযাইফা ও সাদিকুল্লাহ।

ট্রেন ছাড়ার সময় হয়ে গেছে। ট্রেনে উঠে আসন গ্রহণ করলাম। অন্যরকম এক অনুভূতি। হৃদয়ে লালিত স্বপ্ন, ছন্দে ছন্দে পাঠকৃত সেই কাব্যমালা– 'ঝক্‌ঝকাঝক্ ট্রেন চলেছে, ট্রেন চলেছে ...' বাস্তবে রূপ ধারণের সন্ধিক্ষণে। শৈশবে এই কবিতাকে কেন্দ্র করে স্মৃতিপটে এঁকে রাখা স্বপ্নগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে। মেঘনা, তিতাস, বুড়ি ও কুলকুলিয়া বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য নদী ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বুক চিরে বয়ে চলেছে।

রাত ৭ টা ৪৫ মিনিট। আমাদের ট্রেন মেঘনা সেতু অতিক্রম করছে। আমরা এখন ঠিক সেতুর মধ্যখানে। জানালা খুলে বাইরে তাকিয়ে থাকি। নয়নাভিরাম দৃশ্য। আলোর ঝলক নদীর বহমান পানির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে হীরের দানার মতো চিকচিক করছে। অপরূপ সাজে সেজে ওঠা প্রকৃতির চির সুন্দরের আশা জাগানিয়া সে মুহূর্ত। কী অনুপম দৃশ্য। চোখ যে আর বুজে আসছে না। অলক্ষ্যে মুখ ফুটে বের হয়ে আসে 'অপূর্ব'। প্রায় তিন মিনিট এই অপরূপ দৃশ্য অবলোকন করতে থাকি।

রাত ১০টা ছুঁই ছুঁই। আমরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেল স্টেশনে পৌঁছলাম। অটোরিক্সা যোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপকণ্ঠ উলচাপাড়া ইউনিয়নে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক দীনী বিদ্যাপীঠ 'জামি'আতুস সুন্নাহ বি.বাড়িয়া'য় পৌঁছি। সেখানে রাত্রি যাপনের পর পরদিন ভোরে আমরা মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (বড় হুযূর) রহ.এর নামে প্রতিষ্ঠিত 'জামি'আ সিরাজিয়া দারুল উলূম ভাদুঘর' দেখতে যাই। বড় হুযূরের কবর যিয়ারতের সৌভাগ্য হয়। এরপর সেখান থেকে 'জামি'আ ইউনূসিয়া'য় যাই। সেখানে সবাই কিসতি টুপি ব্যবহার করে। পরিবেশ বেশ চমৎকার। সাফাইয়ের প্রতিও ছাত্ররা যথেষ্ট সজাগ। পুরো মাদরাসা ঘুরে ঘুরে দেখলাম।

কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া ছাত্রহত্যার লোমহর্ষক ঘটনাটি যে ভবনে ঘটে সেই ভবনটিও দেখলাম। নির্মাণাধীন একটি নতুন ভবন। কাজ এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি। উক্ত মাদরাসার পাশেই উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেমে দীন ফখরে বাঙ্গাল আল্লামা তাজুল ইসলাম রহ.এর সমাধি মুবারক অবস্থিত। এর একটু পরেই 'খতমে নবুওয়াত মাদরাসা'। যদিও পাশে বসবাসকারীদের সিংহভাগই কাদিয়ানী। তারা আকাশচুম্বি স্থাপনা তৈরি করে রেখেছে। দিনটি ছিল জুমু'আর দিন। তাই ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের সর্ববৃহৎ জামে মসজিদে নামায আদায়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। নামায শেষে ইমাম সাহেব মাইকে ঘোষণা করলেন, 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম বহাল থাকবে' মর্মে এক বিক্ষোভ মিছিল বের হবে।

সুন্নাত শেষে মসজিদ থেকে বের হলাম। দেখতে পেলাম, রাস্তার মোড়ে পুলিশ ব্যারিকেড দিয়ে রেখেছে। সকলেই হেলমেট পরিহিত, সশস্ত্র। অস্থিতিশীল পরিবেশ বিরাজ করছিল। যেহেতু আমাদের অচেনা জায়গা, এজন্য কালক্ষেপণ না করে নিরাপদ স্থানে চলে আসি।

২৬ মার্চ ২০১৬। ফেরার পালা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলস্টেশন পৌঁছলাম। সকাল ১০ টায় আমাদের ট্রেন। উপকূলীয় বাংলাদেশ রেলওয়ে। দুপুর নাগাদ ঢাকায় পৌঁছে নিজ নিজ গন্তব্যের উদ্দেশ্যে পা বাড়াই।

মুহাম্মাদ আবূ বকর সিদ্দীক
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

স্বীকৃতির অ আ

আবূ তোরাব মা'সূম

স্বীকৃতি বিষয়টা এতো কঠিন কেন? এতোদিন ধরে সংবাদ, স্ট্যাটাস, আলেমদের বক্তব্য শুনছি পড়ছি যাতে একজন তরুণ আলেম হিসেবে তারুণ্যের স্বার্থে এবং পরবর্তী প্রজন্ম যেনো পৃথবীতে এসে ভালো ও উন্নত কিছু দেখে বুকভরে শ্বাস নিতে পারে সে নিমিত্তে সবার ভীড়ে আমিও দু-একটি উপকারী পরামর্শ রেখে যেতে পারি! অথচ স্বীকৃতি বিষয়ে আমার মাথায় সুনির্দিষ্ট কিছুই আসছে না। কতোজনরে ধরেধরে বলি, ভাই! লজ্জা দিয়েন না, স্বীকৃতি বিষয়ে আমার মাথায় কিছুই ধরছে না, যারা বয়সে আমার ছোট তারাও দেখি এই দাঁতভাঙ্গা বিষয়টি খুব বুঝছে এবং নানা পরামর্শ রাখছে। আমি বড় হয়েও বুঝছি না তাই কাউকে জিজ্ঞেস করতে লজ্জা লাগে। আপনে ভাই আমার সাথে তো খোলামেলা, আমাকে স্বীকৃতিটা একটু বুঝিয়ে দিবেন? কেশে নিয়ে গাম্ভীর্যের সাথে মোটামুটি সবাই একটি লম্বা বক্তব্য শেষ করে নিজের মতো। মাঝে থাকে আমার অসংখ্য প্রশ্ন। সবশেষে মনে হয় একটি দুঃস্বপ্ন দেখে আমার ঘুম ভাঙলো। হাদীসের উপর আমল করে আউযুবিল্লাহ পড়ে বামে থুথু নিক্ষেপ করে চলে আসি। আমি যাঁদের সবচে বেশি পছন্দ করি- আমার আব্বু, মুফতী মনসূরুল হক সাহেব, মাওলানা আব্দুল মালেক সাহেব ও আদীব হুযূর– এঁরা তো সারাদিন পড়াশোনা অর্থাৎ গভীর ইলম ও আমল নিয়েই থাকেন। অথচ স্বীকৃতি বিষয়ক কোন স্টেজে নেই এঁরা। স্বীকৃতির পুরনো আন্দোলনের সময় এ বিষয়ে এঁদের কিছু মন্তব্য শোনা গেলেও বর্তমানে যখন স্বীকৃতি নিয়ে সবখানে দারুণ তোড়জোড় তখন এঁদের পৃথিবীতে নেমে এসেছে রাজ্যের নীরবতা! ঘরোয়ালোকেও এঁদের স্বীকৃতি নিয়ে কিছু বলতে শোনা যাচ্ছে না। কেউ কিছু বললে দু-এক কথা বলেই পাশ কাটিয়ে যাচ্ছেন। এখন যেনো এঁদের নিভৃতচারিতা ও ইলমী ব্যস্ততা আগের চে' কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। এঁদের এমন ভয় হচ্ছে না তো, এদেশে ইলমের বরকতপূর্ণ স্বাধীন ব্যস্ততা হয়তো শেষ হওয়ার পথে; তাই শেষমেষ এই খোলামেলা নিয়ন্ত্রণমুক্ত ব্যস্ততাকে ভালোবেসে যতোটা পারা যায় শক্ত করে জড়িয়ে ধরা যাক। আমি বলছি না, এঁরাই একমাত্র আলেম। আমি এঁদের একটু বেশি ভালোবাসি। দীনের খেদমত করার সৌভাগ্য যদি হয় তাহলে এঁদের মশালের আলোতেই পথ চলবো প্রত্যয় রাখি। তাই এঁদের নীরবতা আমার মাঝে ভয় সৃষ্টি করছে। ওদিকে স্বীকৃতি বিষয়ে এঁদের কাছে যে কিছু জানতে চাইবো সে জানতে চাওয়া পরিমাণ ধারণাও পাচ্ছি না স্বীকৃতি বিষয়ে। সবকিছু যেন কেমন ঘোলাটে। পুঁজিবাদের বিজ্ঞাপনের চে-ও এগিয়ে বর্তমান সরকার। তাঁরা এতো রাতারাতি কোন একটা ইস্যুর আফিম পুরো দেশবাসিকে খাইয়ে দিতে পারে কিভাবে আল্লাহই জানেন। ক'দিন আগেও স্বীকৃতি-ফিকৃতি কিচ্ছু ছিলো না। অথচ আলেম-উলামা যারা একটি দেশের শ্রেষ্ঠ নাগরিক, শ্রেষ্ঠ বিবেকবান এবং একটি সুস্থ সভ্যতার মেরুদণ্ড- সরকারের শুধু ইচ্ছে হলো তাই চকিতে কোন এক প্রভাত থেকে স্বীকৃতির মুলো ঝুলিয়ে এই তাঁদেরকে নাচিয়ে মারছে। কেউ আক্রান্ত টাকার লালসায়, কেউ ধান্ধায় পদ-পদবীর, কেউ মুখোশ পরে নেমেছে নবীওয়ালা শিক্ষা চিরতরে ধ্বংসের নিমিত্তে, কারো আছে অন্যান্য স্বার্থ। কোন্টার জন্য কে সেটা যদিও অস্পষ্ট!

এই নানামুখী স্বার্থের ভীড়ে ওঁৎ পেতে আছে সরকার, ঝোপ বুঝে কোপ মেরে নিজের স্বার্থটা সিদ্ধি করে নিতে। তাই তরুণ প্রজন্মের সর্বোচ্চ মেধা খাটিয়ে বের করতেই হবে এই স্বীকৃতি নামক মুলোটা আসলে কী? তালেতালে নেচে লাভ নেই। শুনে শুনে গাইলে মুক্তি নেই। কারণ ভবিষ্যৎ তরুণদের। অবশ্য তরুণদের স্বপ্নযাত্রা প্রবীণদের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হওয়ার বিকল্প নেই। আমি প্রবীণদের বিরুদ্ধে বলছি না। আমি বলতে চাচ্ছি, স্বীকৃতি-প্রসঙ্গে তরুণদের রেখে কিছু করার কোন সুযোগ নেই। তরুণদের মতামত, তাদের চিন্তাগুলোও সামনে আনতে হবে। তরুণদের জাগিয়ে তুলে, তাদেরকে সাথে নিয়ে প্রবীণদের যেকোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রবীণদের পর তাঁদের মীরাস তো তরুণদেরই। সেই মীরাসে যেনো কোন জালিয়াতি না হয় এ ব্যাপারে তরুণদেরও জাগ্রত থাকতে হবে।

কুরআন ও হাদীসের সঠিক শিক্ষা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-ও বলা হয়েছে আমাদের, এই শিক্ষা, এই ইলম বড় স্পর্ষকাতর। যে অঞ্চলে এর মূল্যায়ন হবে না, সে অঞ্চল ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে সে আশ্রয় নেবে। তাই আমাদের সচেতন থাকা উচিত, স্বীকৃতির ঘোলে পড়ে যেন কোনভাবেই ইলমের অবমূল্যায়ন না হয়ে যায়।

স্বীকৃতি নিলে ভালো হবে, না খারাপ এতো গভীর বিষয়ে ব্যাখ্যামুক্ত বা যুক্ত কোন ধরণের মন্তব্য করার মতো স্পষ্ট ধারণা আমার এখনো অর্জিত হয়নি আগেই বলেছি। তবে স্বীকৃতি বিষয়ে কোন কিছু না বুঝেও সবশেষে আমার এতোটুকু বলতে দ্বিধা নেই যে, স্বার্থান্বেষী কুচক্রী ও পদলোভী সব মহলেই থাকে। আমাদের মহলেও আছে। তবে এতে আমাদের মতো ক্ষমতাহীন তরুণদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই। কারণ আমাদের কথাগুলো মূল্যায়নের মতো ভালো মানুষেরও অভাব নেই। তাছাড়া কিছুকিছু চেহারা আছে এবং সময়োপযোগী এমন কিছু বলিষ্ঠতার বিস্ফোরণ ঘটছে যা দেখে আমরা আশ্বস্ত হতে পারি। বুকে সাহস জাগাতে পারি যে, আমাদের কিচ্ছু হবে না। আল্লাহ ঐ আহমদ শফী সাহেবের বয়ঃজ্যেষ্ঠতা ও শুভ্র দাড়ির উসিলায় আমাদের বাঁচিয়ে নেবেন। নূরুল ইসলাম ওলিপুরী, জুনায়েদ বাবুনগরী ও আরো কিছু ঐকান্তিক ব্যক্তিত্বের উসিলায় স্টেজ ও স্টেজের বাইরে, কারও কথায় ও দাবি-দাওয়ায় যদি কোন 'কিন্তু' থাকে আল্লাহ তা ধুয়ে দিবেন। ইলমের কোন প্রকৃত প্রেমীর নিভৃত চোখের জলে সরকারের যদি কোন 'উদ্দেশ্য' থাকে আল্লাহ সেটাও ধুলিস্মাৎ করে দিবেন।

শিক্ষার্থী,
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা

রাবেতা সংবাদ

হারাম শরীফে দু'আ মজলিস

গত ৬ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ৪ যিলহজ্জ পবিত্র মক্কা মুকাররমায় ইবরাহীম খলীল রোডস্থ 'মাআছির যিয়াফা' হোটেল মিলনায়তনে রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার উদ্যোগে হযরত পাহাড়পুরী রহ.এর মাগফিরাত কামনায় এক বিশেষ দু'আ মজলিসের ইন্তিজাম করা হয়।

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার সম্মানিত মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা কারী মুনীরুয্যামান সাহেব (কারী সাহেব হুযূর)এর হৃদয়ছোঁয়া তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অতঃপর হযরত পাহাড়পুরী রহিমাহুল্লাহ'র জীবন ও কর্ম সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করেন হুযূরের বড় সাহেবযাদা মাওলানা আশরাফুয্যামান, হুযূরের বড় জামাতা মাওলানা আব্দুর রশীদ কাসেমী, মেজো জামাতা মাওলানা ইমরান কাসেমী। এরপর জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার নায়েবে মুফতী, দ্বি-মাসিক 'রাবেতা'র মুহতারাম সম্পাদক মুফতী সাঈদ আহমাদ দা.বা. স্মৃতিচারণমূলক আলোচনা পেশ করেন। সবশেষে জামি'আর প্রবীণ মুহাদ্দিস মুফতী ইবরাহীম হাসান সাহেব দা.বা. এর স্মৃতিচারণ ও দু'আর মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

মুফতী ইবরাহীম হাসান সাহেব স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে অঝোরে কাঁদতে থাকেন। এ সময় উপস্থিতিদের চোখগুলোও অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়ে।

মজলিসে আরো উপস্থিত ছিলেন জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার সাবেক উস্তাদ হযরত মাওলানা মুয্যাম্মিলুল হক সাহেব, রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার সম্মানিত নায়েবে আমীর মাওলানা আব্দুল মালেক, অর্থ সম্পাদক মুফতী শাহ আলম, সহসম্পাদক মুফতী তাফাজ্জুল হুসাইন, মুফতী মাহমূদুল আমীন, প্রচার সম্পাদক মুফতী শহীদুল ইসলাম, দাওয়াত ও তাবলীগ সম্পাদক মুফতী সাইফুল ইসলাম, দ্বি-মাসিক 'রাবেতা'র সম্পাদনা সহযোগী মাওলানা মাকসূদুর রহমান, রাবেতা সদস্য মুফতী আলআমীন, মাওলানা আব্দুল খালেক, মাওলানা মুনীরুল ইসলাম, মাওলানা রহমতুল্লাহ ফকীর, মাওলানা আব্বাস হানীফ প্রমুখ।

এছাড়াও পাহাড়পুরী হুযূর রহ.এর ছোট জামাতা মাওলানা শামসুদ্দীন কাসেমী, মাওলানা শরীফুল ইসলাম, ডা. এখলাসুর রহমান, ডা. শিবলী নো'মানী প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও উক্ত দু'আ মজলিসে উপস্থিত হয়েছিলেন।

রাবেতায়ে আবনায়ে রাহমানিয়ার সম্মানিত যিম্মাদার মুফতী নজরুল ইসলামের সঞ্চালনায় মজলিসটি পরিচালিত হয়।

মেহমানদের আপ্যায়নের ইন্তিজাম করেন রাবেতার অর্থ সম্পাদক এস.এন ট্রাভেলসের সত্বাধিকারী মুফতী শাহ আলম।

ফেনী সফরে রাবেতা প্রতিনিধি দল

রাবেতা প্রতিনিধি দল গত ৩ ও ৪ সেপ্টেম্বর রোজ শনি ও রবি ফেনী জেলা সফর করেন। ফেনী জেলার প্রায় চৌদ্দটি মাদরাসার শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম ও তলাবায়ে ইযামের সাক্ষাত বিনিময় ও যিয়ারত ছিল এ সফরের অন্যতম লক্ষ্য। প্রতিনিধি দলের প্রধান ছিলেন জামি'আ রাহমানিয়ার শাইখে সানী ও রাবেতার অন্যতম মুরব্বী মাওলানা আব্দুর রায্যাক মানিকগঞ্জী। আরো ছিলেন রাবেতা মজলিসে শূরার সম্মানিত সদস্য জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার নায়েবে মুহতামিম মুফতী ইবরাহীম হিলাল ও শিক্ষাসচিব মুফতী হিলালুদ্দীন গাজীপুরী। এছাড়াও ছিলেন রাবেতার দায়িত্বশীল মাওলানা আনওয়ারুল হক, মাওলানা শফীকুর রহমান টাঙ্গাইলী, মাওলানা শফীক সালমান কাশিয়ানী, মাওলানা ইমদাদুল্লাহ ও মাওলানা আব্দুল হান্নান প্রমুখ। সফর সহযোগিতায় স্থানীয় উলামায়ে কেরামের মধ্য থেকে ছিলেন দারুল উলূম আলহুসাইনিয়া, উলামাবাজার, সোনাগাজি, মাদরাসার মুহাদ্দিস মাওলানা আব্দুল কাহের আলমাদানী, জামি'আ ইসলামিয়া ফেনীর মুহতামিম মাওলানা মুমিনুল হক জাদীদ, জামি'আ ইসলামিয়া সুলতানিয়া লালপোল ফেনীর মুঈনে মুহতামিম মাওলানা কারী কাসেম, শর্শদি ইসলামিয়া মাদরাসা ফেনীর মুদাররিস মুফতী সাইফুল ইসলাম ও রাবেতা সদস্য মাওলানা নজরুল ইসলাম।

উল্লেখ্য, 'রাবেতা'র আগামী সংখ্যায় ফেনী সফরের গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলো প্রকাশিত হবে ইনশা-আল্লাহ।

সফরের ধারাবাহিকতায় নিম্নে মাদরাসাগুলোর নাম প্রদত্ত হল-

১. দত্তাসার রাহমানিয়া মাদরাসা।
২. জামি'আ হুসাইনিয়া, মহীপাল, ফেনী।
৩. জামি'আ ইসলামিয়া সুলতানিয়া, লালপোল, ফেনী।
৪. কদমতলা মাদীনাতুল উলূম মাদরাসা, সোনাগাজি, ফেনী।
৫. দারুল উলূম আলহুসাইনিয়া উলামাবাজার, সোনাগাজি, ফেনী।
৬. তা'লীমুদ্দীন হালীমিয়া, সোনাগাজি, ফেনী।
৭. বালুয়া চৌমুহনী আরাবিয়া মাদরাসা, ফেনী।
৮. জামি'আ রশীদিয়া, লক্ষরহাট, ফেনী।
৯. দারুল উলূম, ফেনী।
১০. ফুলগাজি আশরাফিয়া মাদরাসা, ফুলগাজি, ফেনী।
১১. ছাগলনাইয়া আজীযিয়্যাহ মাদরাসা, ছাগলনাইয়া, ফেনী।
১২. জামি'আ মাদানিয়া, চিলুনিয়া, ফেনী।
১৩. শর্শদি ইসলামিয়া দারুল উলূম, ফেনী।
১৪. জামি'আ ইসলামিয়া, ফেনী।

দ্বি-মাসিক রাবেতায় লেখা পাঠানোর ঠিকানা

রাবেতা কার্যালয়

জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
আলী অ্যান্ড নূর রিয়েল এস্টেট,
সাতমসজিদ, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭
ই-মেইল: rabetaar@gmail.com
মোবাইল
০১৮২৬৬২১৬৬৯, ০১৯২৭৩২৪৬৪৭,
০১৯১২০৭৪৪৯৫